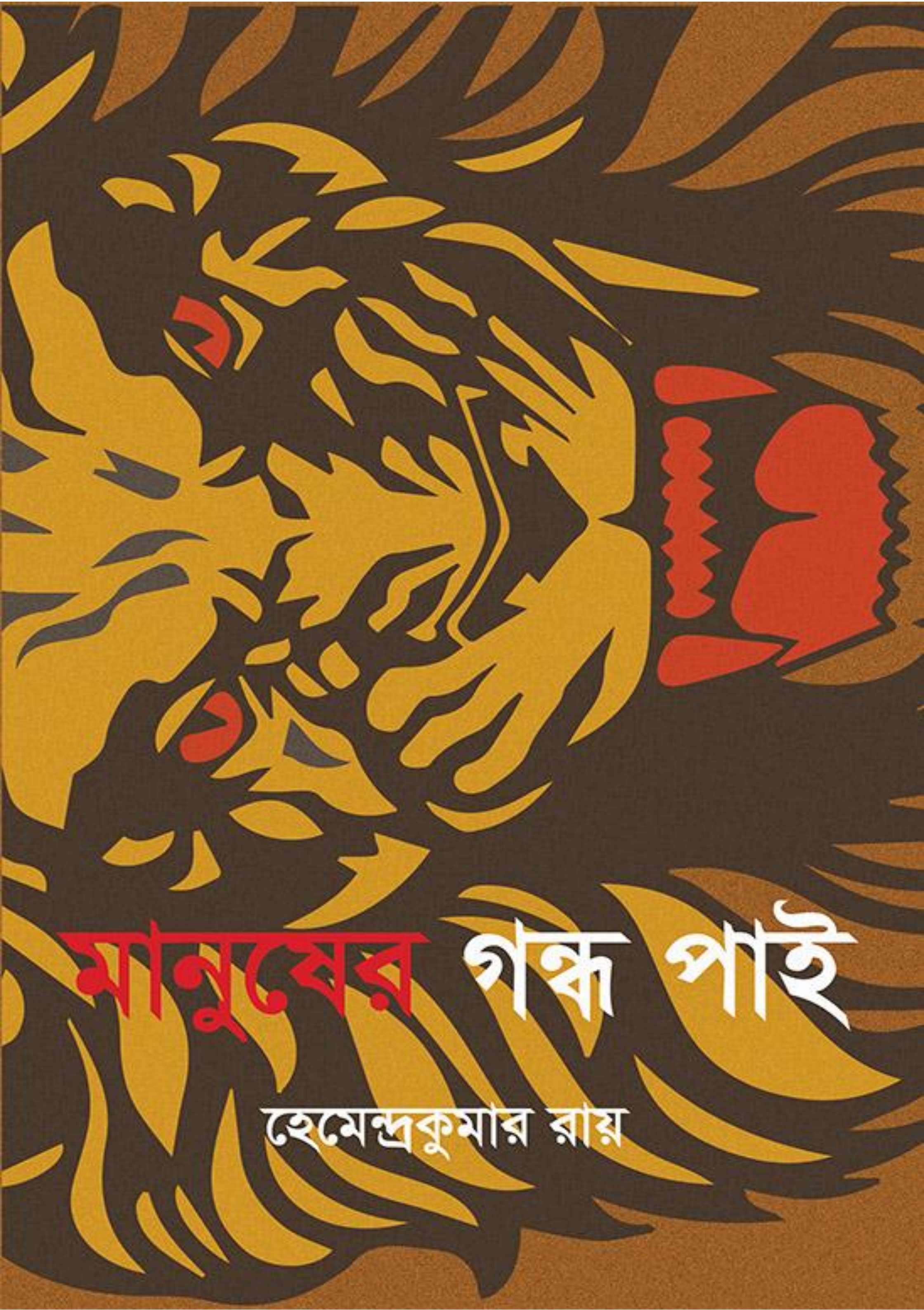
মানুষের গন্ধ পাই
হেমেন্দ্রকুমার রায়

# মানুষের গন্ধ পাই

হেমেন্দ্রকুমার রায়

eBook Created By: **Sisir Suvro**

**Find More Books!**

**Gooo....**

www.shishukishor.org

www.amarboi.com

www.banglaepub.com

www.boierhut.com/group

# এক

রেলপথের কাজে কোনও বাধা-বিঘ্ন ছিল না—বেশ শান্তিতে দিন কাটছিল। কিন্তু এ আরাম বেশিদিন আর ভোগ করতে হল না। হঠাৎ একদিন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের সুখের ঘুম গেল চমকে।

দুটো মানুষখেকো সিংহ এসে আচম্বিতে বিপুল-বিক্রমে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। এই যুদ্ধ শেষ করতে সুদীর্ঘ নয় মাস কাল কেটে গিয়েছিল। মাঝে তাদের অত্যাচার এমন বেড়ে ওঠে যে, প্রায় তিন হপ্তা ধরে হাজার হাজার লোক রেলপথের কাজ বন্ধ করে অলস ভাবে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

দেখতে দেখতে সিংহরা মানুষ-ধরা কাজে এমনি পাকা হয়ে উঠল যে, কোনও বাধাকেই আর বাধা বলে, কোনও বিপদকেই আর বিপদ বলে মানত না। প্রতি রাত্রেই তাবুর ভিতর থেকে মানুষের পর মানুষ অদৃশ্য হতে লাগল—আমাদের সমস্ত সাবধানতাই তাদের অদ্ভুত চালাকির কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল।

কুলিরা বলতে লাগল, জঙ্গল থেকে রোজ রাত্রে যারা এখানে হানা দিতে আসে আসলে তারা সাধারণ জানোয়ার নয়, তারা হচ্ছে আফ্রিকার বুনো মানুষদের প্রেতাত্মা, তাদের দেশের বুকে বিলিতি রেলের লাইন বসেছে দেখে তারা চটে গেছে, তাই সিংহের মূর্তি ধারণ করে রোজ আমাদের ঘাড় ভাঙতে আসে। তারা অবধ্য,—বন্দুকের গুলি তাদের গায়ে লাগে না। তারা অমর, গুলি খেয়েও তারা মরে না। ইত্যাদি।

পরে পরে কয়েকজন কুলি অদৃশ্য হল। প্রথম প্রথম আমি ভাবতুম যে, কুলিদের দলে নিশ্চয়ই কোনও দুষ্টু লোক আছে। তারাই টাকার লোভে তাদের খুন করে জঙ্গলের ভিতর গিয়ে লাশ ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু আমার এ সন্দেহ যে ভুল, শীঘ্রই তার প্রমাণ পেলুম।

সাভোয় পৌঁছোবার প্রায় হপ্তা-তিনেক পরে, একদিন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেই শুনলুম, কাল রাতে সিংহরা এসে তাবুর ভিতর থেকে জমাদার অঙ্গন সিংকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফলার করেছে।

অঙ্গন সিং হচ্ছে একজন লম্বা-চওড়া জোয়ান শিখ। গতিক তো বড়ো সুবিধের নয়! তাড়াতাড়ি উঠে অঙ্গন সিং-এর তাবুর দিকে অগ্রসর হলুম।

তাবুর আশেপাশে বালির উপরে রয়েছে স্পষ্ট সিংহের পায়ের দাগ! সে দাগ বরাবর বনের ভিতরে চলে গিয়েছে। বুঝলুম, কুলির মিথ্যা বলে না। সিংহরাই তাদের সঙ্গে শয়তানি করছে বটে।

অঙ্গন সিং-এর তাবুতে আরও বারোজন কুলি বাস করত। রাত্রের ভীষণ কাণ্ড তারা স্বচক্ষে দেখেছে। তাদেরই মুখে সমস্ত শুনলুম।

জমাদার অঙ্গন সিং তাবুর খোলা দরজার কাছেই শুয়ে ঠান্ড হাওয়ায় খুব আরাম করে ঘুমোচ্ছিল। মাঝ-রাতে হঠাৎ আমরা দেখলুম, একটা মস্ত সিংহ তাবুর ভিতরে মুখ বাড়িয়ে জমাদারের গলাটা হাঁ করে দাঁতে চেপে ধরলে।

জমাদার বলে উঠল, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও— বলেই সে দুই হাতে সিংহের গলা জড়িয়ে ধরলে।

—পরমুহূর্তেই জমাদারকে নিয়ে সিংহটা অন্তর্হিত হল। ভয়ে তখন আমাদের হাত-পা হিম হয়ে গেছে! কাঁপতে কাঁপতে শুনলুম, সিংহের সঙ্গে জমাদারের বিষম লড়াইয়ের ঝটাপটি শব্দ! জমাদার সহজে কাবু হয়নি। কিন্তু কী করবে সে? সিংহের সঙ্গে মানুষ কখনও যুঝতে পারে?

এই ভয়ানক গল্প শুনে কাপ্তেন হ্যাসলেমকে নিয়ে আমি সিংহের পায়ের দাগ ধরে জঙ্গলের ভিতরে অগ্রসর হলুম। সিংহটা যেখানে যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেইখানেই রক্তের স্রোতে জমি তখনও ভিজে রাঙা হয়ে আছে।

তারপরেই বনের ভিতরে এক জায়গায় গিয়ে দেখলুম, সে কী দৃশ্য! দুঃস্বপ্নেও তা কল্পনা করা যায় না! চারিপাশকার জমি রক্তে আরক্ত এবং মাংস

আর হাড়ের টুকরোয় ভরা। জমাদারের দেহ আর নেই বটে, কিন্তু হতভাগ্যের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মুণ্ডটা তখনও আস্ত অবস্থায় মাটির উপরে বসানো রয়েছে! মুণ্ডের চোখ দুটো বিস্ফারিত—তার মধ্যে সচকিত আতঙ্ক-ভরা দৃষ্টি তখনও স্তম্ভিত হয়ে আছে।

জমির চারিদিকেই ধস্তাধস্তির জিহ্ন দেখলেই বেশ বোঝা যায়, জমাদার-বেচারার দেহ নিয়ে দু-দুটো সিংহ পরস্পরের সঙ্গে কামড়া-কামড়ি ও টানা-হ্যাচড়া করেছে।

এমন বীভৎস দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি ...জমাদারের দেহের টুকরো-টাকরা যা পাওয়া গেল, আমরা তখনই তা সংগ্রহ করে মাটির ভিতরে গোর দিলুম—এবং যতক্ষণ আমরা এই কার্যে নিযুক্ত ছিলুম, ততক্ষণই সেই বুক-চমকানো কাটামুণ্ডটা তার স্থির, ভীত দৃষ্টি দিয়ে যেন আমাদের প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। সে-মুণ্ডকে গোর দিতে পারলুম না—কারণ শনাক্ত করবার জন্যে ডাক্তারের কাছে তাকে হাজির করতে আমরা বাধ্য।

মানুষখেকো সিংহের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। ...এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করলুম যে, অতঃপর এই শয়তানদের শাস্তি দেওয়াই হবে আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু তখনও আমি জানতুম না যে, আমার কর্তব্য কত কঠিন ও বিপজ্জনক এবং কতবার আমার অবস্থা হবে অভাগা অঙ্গন সিং-এরই মতন ভয়ানক !

জমাদার অঙ্গন সিং-এর তাবুর কাছাকাছি একটু গাছের উপর বন্দুক নিয়ে উঠে সেই রাত্রেই আমি বাসা বাঁধলুম। সিংহের যে-তাবুর ভিতর থেকে খোরাক পেয়েছে, রাতে হয়তো খিদের চোটে আবার সেইখানেই এসে হানা দেবে, এই হচ্ছে আমার আশা। যে-সব কুলি খুব বেশি ভয় পেয়েছে, তারাও আমার সঙ্গে গাছের ডালে বসে রাত কাটাবে বলে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। আমিও সম্মতি দিলুম।.

নিশুতি রাত। আচম্বিতে ঘন ঘন সিংহগর্জনে সমস্ত অরণ্য থর থর করে কাঁপতে লাগল। আমিও বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলুম—অন্তত আজ ওদের একটারও মানুষ খাবার সাধ যে চিরদিনের জন্যে মিটিয়ে দিতে পারব, এ-বিষয়ে আমার মনের বিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠল।

সিংহের গর্জন ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে—কাছে, আরও কাছে! তারপর হঠাৎ সব চুপচাপ। ঘণ্টাদুয়েক আর তাদের কোনও সাড়া নেই।

আমার জানা ছিল, সিংহেরা যখন শিকার করতে উদ্যত হয়, তখন তারা আর কোনও শব্দই করে না।

কোথাও কিছু নেই, অকস্মাৎ আধ-মাইল দূর থেকে বিষম এক গোলমাল জেগে উঠে রাতের অন্ধকার আকাশকে যেন অস্থির করে তুললে।.

সিংহ যে আবার আজ নতুন শিকার সংগ্রহ করেছে সে বিষয়ে আর আমার কোনও সন্দেহই রইল না। আজকের মতো গাছে বসে রাত্রিবাসই ব্যর্থ হল—কারণ শত্রু আমার নাগালের বাইরে!

পরদিন প্রভাতেই খবর এল, আমার আর-একজন কর্মচারীর দেহ সিংহের উদরে সমাধিলাভ করেছে।

কাল সারা রাত ঘুম হয়নি—আজকের রাতটা বিশ্রাম করলুম।

তারপরের রাতে আবার নতুন ঘটনাস্থলের কাছেই আর একটা গাছের উপরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। গাছের তলায় একটা জ্যান্ত ছাগলকে বেঁধে রাখলুম—লোভে পড়ে সিংহটা নিশ্চয়ই তার ঘাড় মটকাতে আসবে।

গাছে চড়ে ভালো করে বসতে না বসতেই টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হল। আমার কাপড়চোপড় ও দেহ ভিজে ন্যাতনেতে হয়ে গেল, তবু আমি সতর্ক হয়ে রইলুম।

কিন্তু বৃথা গভীর রাতে দূর থেকে আবার এক মর্মান্তিক আর্তনাদ জেগে উঠল—আমি বুঝলুম, পশুরাজ আবার আজ নতুন নরবলি দিলে! গাছের ডালে বসে নিরুপায় হয়ে নিজের হাত আমি নিজেই কামড়াতে লাগলুম।

কুলিদের তাবুগুলো প্রায় আট মাইল জায়গা জুড়ে ছড়ানো ছিল। কাজেই কবে, কখন, কোথায় যে সিংহেরা এসে হানা দেবে, এটা স্থির করা সম্ভবপর ছিল না। তাদের চালাকি দেখে অবাক মানতে হয়। তারা উপর-উপরি দু-রাত্রি কখনও একই তাবুকে আক্রমণ করত না।

প্রথম প্রথম তারা সব-সময়েই যে সফল হত, তাও নয়। এক রাতে একজন ভারতীয় ব্যাপারী কুলিদের তাবুতে আসছিল, একটা গাধার পিঠে মেটমাট চাপিয়ে। অন্ধকারের ভিতর থেকে—বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো—হঠাৎ এক সিংহ তাদের উপরে ঝাপিয়ে পড়ল, তার বিপুল দেহের ধাক্কায় গাধা আর মানুষ দুই-ই হল কুপোকাত!

কিন্তু একগাছা মোট দড়িতে বাধা ছিল দুটো টিনের খালি কানাস্তারা এবং সিংহের থাবাতে গেল আটকে সেই দড়িগাছা। খালি কানাস্তারা মাটির উপরে আছড়ালে কী বেজায় আওয়াজ হয়, তোমরা তা শুনেছ বটে, কিন্তু সিংহ তা কখনও শোনেনি। দড়ি থেকে থাবা ছাড়াবার জন্যে সিংহ যতই টানাটানি করে, কানাস্তারা ততই ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে। সিংহ ভাবলে, বাপরে, এ আবার কী নতুন জানোয়ারের চিৎকার! পেটের খিদে তার মাথায় চড়ে গেল, প্রাণের ভয়ে তখনই ল্যাজ গুটিয়ে সে দিলে চটপট চম্পট! ইতিমধ্যে সেই ব্যাপরী খুব ঢাঙা এক গাছের মগডালে উঠে গিয়ে থর থর করে কাপতে লাগল। বলা বাহুল্য, পরের দিন সকালের আগে সে আর মাটির উপরে পা দেয়নি।

এমনি মজার ঘটনা আরও দু-একটা ঘটেছিল। আর একবার সিংহরা একটা তাবুতে মানুষ ধরতে এসে ভুল করে চালের একটা বস্তা টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আর এক রাতে তারা তোশক-সুদ্ধ একজন গ্রিক কন্ট্রাক্টরকে টেনে

নিয়ে যায়। কিন্তু বনের ভিতরে গিয়ে দেখলে, দুষ্ট্র মানুষটা কোনও ফাঁকে তোষক থেকে উঠে চুপিচুপি লম্বা দিয়েছে।

কিন্তু পরে তারা আর ভুল করত না। তাবুর দরজা বন্ধ করে চারিদিকে কাটাঝোপ দিয়ে এবং আগুন জ্বলিয়ে—কোনওরকমেই আর তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারা যেত না; শত শত লোক আকাশ-ফাটানো চিৎকার এবং বন্দুকের আওয়াজ করেও বা জুলন্ত কাঠ ছুড়েও তাদের আর হটাতে পারত না,—কোনও কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ না করেই তারা আমাদের দল থেকে মানুষের পর মানুষ ধরে নিয়ে যেতে লাগল।

# দুই

এই মানুষ-শিকারের সময়ে আমি কিন্তু বিশেষ কোনও সাবধানতা অবলম্বন করিনি। আমার তাবু ছিল একেবারে খোলা জায়গায় এবং তার চারদিকে সিংহদের বাধা দিতে পারে, এমন কোনও কাঁটাঝোপের বেড়া পর্যন্ত ছিল না। ও-অঞ্চলের ডাক্তার রস একদিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। .....রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, বাইরে তাবুর দড়ির সঙ্গে কে যেন ঝটাপটি করছে। কিন্তু লণ্ঠন জ্বেলে বাইরে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলুম না। .....সকলে উঠে ভালো করে পরীক্ষা করবার সময়ে দেখা গেল, জমির উপরে সিংহের থাবার দাগ। বুঝলুম, ভাগ্যের জোরে কাল রাত্রে এ যাত্রা কোনওরকমে বেঁচে যাওয়া গেছে!

তখনই সেখান থেকে তাবু তুলে ফেললুম। এবং নদীর ধারে একখানা কুঁড়েঘর বানিয়ে সেইখানেই আড্ডা গাড়লুম। এবং ঘরের চারিদিকে খুব উঁচু ও পুরু কাটাঝোপের বেড়া লাগিয়ে দিলুম। আমার চাকর-বাকররা এই বেড়ার ভিতরে আশ্রয় নিলে। এবং সারারাত যাতে উজ্জ্বল আগুন জ্বলে, সে ব্যবস্থাও করা হল।

সন্ধ্যার সময়ে দিনের কাজ সাঙ্গ করে আমি কুঁড়ের বারান্দায় এসে বসতুম। কিন্তু সেখানে বসে কোনওরকম লেখাপড়া করবার জো ছিল না, কারণ সর্বদাই বুকটা ধুকপুক করত! কী জানি, সিংহমশাই কখন একলাফে ‘পাঁচিল টপকে হালুম, তোমায় খেলুম' বলে ভিতরে এসে পড়েন, বলা তো যায় না! কাজে কাজেই বন্দুকটা সর্বদাই রাখতুম কাছে কাছেই। এবং থেকে থেকে ভয়ে ভয়ে বেড়ার ওপারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতুম, যেখানে স্থির ও স্তব্ধ হয়ে আছে কালির মতো কালো ভয় ভরা ঘন অন্ধকার! এক-একদিন সকালে উঠে দেখতুম, বেড়ার ওপারে

মাটির উপরে সিংহরা পদচিহ্ন রেখে গেছে! সৌভাগ্যক্রমে কোনওদিন তারা বেড়া ডিঙোবার চেষ্টা করেনি।

এর মধ্যে কুলিরাও তাদের তাঁবুর চারিদিকে কাটাঝোপের বেড়া তৈরি করে ফেলেছিল। কিন্তু তবু প্রতি দুই-তিন দিন অন্তরেই শোনা যেত, অমুক তাঁবু থেকে অমুক কুলিকে সিংহরা ধরে নিয়ে গেছে! দুই-তিন হাজার কুলি অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাস করত, কাজেই এই দুর্ঘটনাও তাদের খুব বেশি বিচলিত করতে পারত না। কারণ তারা প্রত্যেকেই মনে করত, এত খোরাকের ভিতর থেকে সিংহের লোভ হয়তো তার উপরে পড়বে না। কিন্তু তারপর অধিকাংশ কুলি যখন অন্যত্র কাজ করতে চলে গেল অবং আমার সঙ্গে রইল মাত্র কয়েক শত কুলি, তখন সিংহের অত্যাচার হয়ে উঠল অত্যন্ত স্পষ্ট। কুলিরা এত ভয় পেলে যে, অনেক কষ্টে আমি তাদের কাজ করাতে পারতুম। তাদের তাঁবুর বেড়া আরও উঁচু করে দিলুম—এবং চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখবারও ব্যবস্থা হল। জনকয়েক লোক বড়ো বড়ো গাছে চড়ে সারা-রাত অনেকগুলো কানাস্তারা নিয়ে এমন জোরে বাজাত যে, কান যেন কালা হয়ে যাবার মতো হত। কিন্তু তবু বেপরোয়া সিংহরা কিছুমাত্র গ্রাহ্য করত না—তাবুর ভিতর থেকে লোকের পর লোক অদৃশ্য হতে লাগল!

আমার কুঁড়েঘরের কাছ থেকে খানিক তফাতে ছিল হাসপাতাল-তাবু। তার চারিধারের বেড়া ছিল খুবই উঁচু আর মজবুত। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না, সিংহরা সেই বেড়ার ভিতরেও একটা পথ তৈরি করে ফেললে ...এক রাত্রে সন্দেহজনক শব্দ শুনে হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, মস্ত বড়ো একটা সিংহ তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে! তাকে দেখেই সিংহ মারলে এক লাফ! ডাক্তার ভয়ে আঁতকে পিছনপানে একলাফে মেরে একেবারে পড়লেন গিয়ে একরাশ ডাক্তারি ওষুধ-পত্তরের মধ্যে! হুড়মুড়

করে সমস্ত ভেঙে পড়ল এবং সেই বিষম শব্দে ভড়কে গিয়ে সিংহটা অন্যদিকে সরে পড়ল।

ডাক্তার সেবারের মতো বেঁচে গেলেন বটে কিন্তু সিংহটা খালি পেটে ফিরে যেতে রাজি হল না। সে হাসপাতালের আর একটা ঘরের ভিতরে গিয়ে হানা দিলে, সেখানে নয়জন রোগী শয্যাশায়ী ছিল। দুজন রোগীকে আহত করে, তৃতীয় রোগীর দেহকে সে কাটাঝোপের ভিতর দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। পরদিন সকালে গিয়ে দেখলুম, একটা র্তাবু ছিড়ে ভূমিসাৎ হয়েছে এবং তার তলায় পড়ে কাতরাচ্ছে দুই বেচারি আহত কুলি। সেইদিনই সেখান থেকে হাসপাতাল তুলে আর-একটা সুরক্ষিত জায়গায় স্থানান্তরিত করা হল।

শুনেছিলুম, সিংহরা প্রায়ই খালি-তাঁবুর ভিতরে বেড়াতে আসে। তাই রাত্রে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে আমি বন্দুক নিয়ে তৈরী হয়ে পরিত্যক্ত হাসপাতালের ভিতর বসে সিংহের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু গভীর রাত্রে স্তম্ভিত প্রাণে শুনলুম, নতুন হাসপাতালের ভিতর থেকে মর্মভেদী আর্তনাদ জেগে উঠল! বুঝলুম, শয়তানরা এবারেও আমাকে ফাঁকি দিলে।

সকাল হতে না হতেই ছুটলুম নতুন হাসপাতালের দিকে। সিংহট কাল রাতে বেড়া টপকে ভিতরে এসেছে এবং এক বেচারি ভিস্তিকে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে! যে-সব কুলি স্বচক্ষে সমস্ত ঘটনা দেখেছে, তারা যা বললে তা হচ্ছে এই:

তাবুর ক্যাম্বিসের দেওয়ালের দিকে পা ছড়িয়ে ভিস্তি পরম আরামে ঘুমোচ্ছিল। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একটা সিংহ এসে তাবুর তলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভিস্তির পা কামড়ে ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। হতভাগ্য ভিস্তি সিংহের কবল থেকে বাঁচবার জন্যে প্রথমে একটা সিন্দুক, তারপর তাবুর একগাছা দড়ি দুই হাতে প্রাণপণে চেপে ধরলে, কিন্তু মিথ্যা চেষ্টা! ভিস্তিকে তাবুর বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে সিংহটা তার পা ছেড়ে টুটি কামড়ে ধরে বারকয়েক ঝটকান দিতেই বেচারার সমস্ত আর্তনাদ চিরদিনের জন্যে থেমে গেল। তারপর

বিড়াল যেমন ইঁদুরের মুখে করে, তেমনিভাবে বিস্তির দেখে মুখে করে সিংহটা কাঁটাঝোপের বেড়া ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

যেখান দিয়ে সিংহটা বাইরে বেরিয়ে গেছে, সেইখানে গিয়ে দেখলুম, কাঁটাঝোপের গায়ে ছেড়া কাপড়ের ও রক্তাক্ত মাংসের টুকরো লেগে রয়েছে। বাইরে খানিক তফাতেই ভিস্তির দেহাবশেষ পাওয়া গেল। দেহাবশেষ তো ভারী! মাথার খুলি, দু-খানা চোয়ালের ও দেহের খানকয় বড়ো বড়ো হাড়, হাতের খানিকটা অংশ—তাতে তখনও দুটো আঙুল সংলগ্ন রয়েছে এবং একটা আঙুলে একটা রুপোর আংটি! আংটিটা ভারতবর্ষে অভাগা ভিস্তির বিধবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সেইদিন বৈকালেই খবর পাওয়া গেল, মাইল-তিনেক তফাতে দুটো সিংহের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে! প্রথমে তারা একজন কুলিকে ধরবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই কুলি ছিল তাদের চেয়েও চটপটে । সিংহদের দেখেই সে বিনাবাক্যব্যয়ে একটা মস্ত-লম্বা গাছের উপরে তড়বড় করে উঠে পড়ে। মানুষের দুষ্টুমিতে বেজায় বিরক্ত হয়ে সিংহ দুটো প্রস্থান করে বটে, কিন্তু কুলি-বেচারা ভয়ে আর গাছ থেকে নামতে পারে না। এমন সময়ে সেখান দিয়ে একখানা রেলগাড়ি যায়, তার এক কামরায় ছিলেন ট্রাফিক ম্যানেজার। তিনি জানলা থেকে সেই ভয়ে মরো মরো কুলিকে দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করেন।

তারপরেই দেখা যায়, সিংহ দুটো সাভো ইস্টিশানের কাছে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তারপর রেলের ডাক্তার ব্রক সাহেব সন্ধ্যার অল্প আগে হাসপাতাল থেকে যখন ফিরছিলেন, তখন একজন কুলি দেখতে পায় যে, সিংহটা গুড়ি মেরে চুপিচুপি ব্রক সাহেবের পিছনে পিছনে আসছে।

সিংহেরা পাড়া-ছাড়া হয়নি শুনে আমি দ্বিতীয় হাসপাতালের সামনেই একখানা ঢাকা মালগাড়ি এনে রাখলুম এবং আশেপাশে গোটাকয় গোরুকেও বেঁধে রাখা হল—সিংহদের লোভ জাগাবার জন্যে। রাত্রে বন্দুক নিয়ে আমি সেই

মালগাড়ির ভিতরে এসে ঢুকলুম এবং আমার সঙ্গে এলেন ব্রক সাহেব। তাকে ফলার করবার চেষ্টা করেছিল বলে ব্রক সাহেব যে সিংহের উপরে যার পর নাই খাপ্পা হয়েছিলেন, এ-কথা আর বলা বাহুল্য।

আবার সেই কালির মতো কালো, ঘন অন্ধকার! অরণ্যের নির্জনতা কী একঘেয়ে! হাসপাতালের দিকে তাকিয়ে আছি বটে, কিন্তু চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,—অন্ধকার আমাদের অন্ধ করে দিয়েছে। এমনি ভাবে ঘণ্টাদুয়েক কেটে গেল।

আচম্বিতে ডানদিক থেকে শুকনো পাতার মড়মড়ানি শব্দ এল—বুঝলুম, কাছেই কোনও জানোয়ারের আবির্ভাব হয়েছে! তারপরেই ধুপ করে একটা অস্পষ্ট শব্দ, যেন হাসপাতালের কাটাঝোপের উপর দিয়ে একটা ভারী দেহ লাফিয়ে পড়ল। গোরুগুলো যে ব্যস্ত হয়ে ছটফট করছে, আওয়াজ শুনে তাও বোঝা গেল। তারপর আবার সব চুপচাপ—যেন পরিত্যক্ত শ্মশান!

আমি বললুম, মালগাড়ি থেকে নেমে আমি এবার মাটির ওপরে শুয়ে থাকি। তাহলে সিংহ এদিকে এলে তাকে দেখবার আমার সুবিধা হবে।

কিন্তু ডাক্তার ব্রক মানা করলেন বলে আমি আর গাড়ি ছেড়ে নামলুম না। ভাগ্যে আমি নামিনি! কারণ পরেই টের পেলুম যে একটা নরখাদক সিংহ কাছেই আমাদের জন্যে ওত পেতে বসে আছে। নামলেই তারা আমাকে গপ করে গিলে ফেলত। আমরা যখন চোখ মেলে দেখছি খালি অন্ধকার, সে-বদমাইস তখন অন্ধকারের ভিতরে চোখ চালিয়ে বসে বসে ভাবছিল যে, কোনও কায়দায় আমাদের একজনকে সে গ্রেপ্তার করে পেটে পুরবে!

মনে হল, কেউ যেন চোরের মতো পা টিপে টিপে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে! তার দেহ যেন অন্ধকারের চেয়েও কালো।

এ কি আমার মনের ভুল? যে জমাট অন্ধকারটা এগিয়ে আসছে, তার দিকে বন্দুকের মুখ রেখে শুধালুম, মি. ব্রক! আপনি কি কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

ব্রক সাহেব কোনও জবাব দিলেন না।

আবার ক্ষণিকের জন্যে সমস্ত স্তব্ধ! এবং তারপরেই অন্ধকারের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড একটা দেহ আমাদের দিকে লাফিয়ে পড়ল!

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, সিংহ!—সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনেই বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম! আর-একটু দেরি হলেই আর রক্ষে ছিল না—সে শয়তান তাহলে নিশ্চয়ই মালগাড়ির ভিতরে ঝাপিয়ে পড়ত। কিন্তু একসঙ্গে ডবল বন্দুকের আওয়াজে এবং বারুদের দপ করে জ্বলে ওঠা আগুনে ভয় পেয়ে সিংহটা তখনই সে-মুলুক ছেড়ে চম্পট দিলে!

পরদিন সকালে দেখা গেল, ব্রক সাহেবের বন্দুকের গুলি সিংহের একটা পদচিহ্নের পাশেই বালির ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করেছে—আর এক ইঞ্চি এদিক দিয়ে এলেই গুলিটা ঠিক তার গায়ে লাগত। আমার বন্দুকের গুলির কোনওই খোঁজ পাওয়া গেল না।

নরখাদকের সঙ্গে এই আমার প্রথম মুখোমুখি পরিচয়!

# তিন

মালগাড়ির সামনে বন্দুকের আগুনে আর আওয়াজে বোধহয় সিংহদের চোখ ঝলসে ও পিলে চমকে গিয়েছিল! কারণ অনেকদিন আর তাদের কোনওই খোঁজখবর পাওয়া গেল না। আমরা সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। ব্রক সাহেবের আর প্রতিশোধ নেওয়া হল না, তিনি অন্য দেশে চলে গেলেন।

কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হল যে, সিংহদের এ সুবুদ্ধি বেশিদিন স্থায়ী হবে না। সুতরাং যদি তারা আমার এদিকে বেড়াতে আসে, তাহলে তাদের ভালো করে আদর করবার জন্যে আমি একটা মস্ত ফাঁদ বানিয়ে রাখলুম।

ফাঁদটা হল অনেকটা ইঁদুরের কলের মতো, তবে আকারে তার চেয়ে অনেক বড়ো। ফাঁদের ভিতরে রইল দুটো কামরা। একটা কামরায় থাকবে মানুষ, তাকে খাবার জন্যে সিংহ ভিতরে ঢুকলেই ফাদের দরজাটা যাবে দুম করে পড়ে। সিংহ অন্য কামরায় বন্দি হবে, মানুষের কোনওই ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ দুটো কামরার মাঝে মোটা লোহার রেলিংয়ের পাঁচিল দেওয়া আছে।

মাস-কয় সিংহরা সাভোর কাছে আর এল না বটে, কিন্তু তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের নিত্যনতুন কাহিনি আমাদের কানে আসতে লাগল। দশ-বারো মাইল তফাতে গিয়ে, রেললাইনের অন্যত্র, আবার তারা কুলিদের উপরে আক্রমণ শুরু করেছে। এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাদের কবলে আবার কয়েকজন মানুষের প্রাণ গেল।

সাভোর কুলিরা কিন্তু নিরাপদ শান্তিতে কাল কাটাতে লাগল। তারা ধরে নিলে, শয়তানরা তাদের কথা ভুলে গেছে। নির্ভয়ে সবাই আবার কাজকর্মের যোগ দিলে।

তারপর অকস্মাৎ এক ঘুটঘুটে রাত-আঁধারে আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা ফরসা হয়ে গেল! বিষম এক সোরগোলে আমাদের সকলকার ঘুম গেল ছুটে

এবং সেই পরিচিত আর্তনাদে যখন রাতের আকাশ কেঁপে উঠল, তখন বুঝতে দেরি লাগল না যে, পশুরাজ আবার আজ নতুন পূজার বলি গ্রহণ করলে!

বেজায় গরম পড়েছে, তাঁবুর ভিতরে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। আর তো শয়তানের উপদ্রব নেই, অতএব তাবুর বাইরে গিয়ে একটু আরাম করে শুতে আর বাধা কী? বিশেষ, তাবুর বাইরে যখন শক্ত ও উঁচু বেড়া রয়েছে! এই ভেবে কুলির দল তাবুর বাইরে গিয়ে শুয়েছিল।

হঠাৎ একজন কুলি জেগে সভয়ে দেখে, বেড়া ফুড়ে ভিতরে ঢুকছে ভীষণ এক সিংহ! তখনই শুরু হল হই-চই, হুড়োহুড়ি, লাফালাফি, ছুটোছুটি—সিংহকে টিপ করে ওরই মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ ছুড়লে লাঠি-সোটা, কেউ ছুড়লে ইট-পাটকেল, কেউ ছুড়লে জ্বলন্ত কাঠ! কিন্তু পশুরাজ সেসব তুচ্ছ ব্যাপার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না এবং একটুও ইতস্তত না করে এক হতভাগ্যকে ধরে কাটাঝোপের ভিতর দিয়ে টানতে টানতে বাহিরে নিয়ে গেল। সেখানে আর একটা সিংহ এসে তার সঙ্গে যোগ দিলে। এবং এমনি তাদের বুকের পাটা যে, মানুষের দেহ নিয়ে এবারে তারা আর বনের ভিতরে গেল না, কাটাঝোপের বেড়ার পাশেই বসে তারা আগার আরম্ভ করলে। কুলিদের জমাদার অন্ধকারে তাদের দিকে কয়েকবার বন্দুক ছুড়লে, কিন্তু তাও তারা আমলে আনলে না! নিশ্চিন্ত ভাবে তাদের ভয়ানক ভোজ সমাপ্ত করে তবে তারা সে স্থান ছেড়ে প্রস্থান করলে!

রাত পোয়ালে পর দেখলুম, কুলির দেহের খুব সামান্য অংশই সিংহরা ফেলে গেছে। অন্যান্য কুলিদের মানা করলুম, আজকেই তারা যেন সেই দেহাবশেষ গোর না দেয়।

রাত্রে সেইখানেই বন্দুক নিয়ে আমি জেগে রইলুম—ভাবলুম, দেহের বাকি অংশটা শেষ করবার লোভে সিংহরা আবার যদি ফিরে আসে!

কিন্তু তারা আর ফিরে এল না—এল খালি একটা হায়না।

সকালেই খবর এল, মাইল-দুয়েক দূরের এক তাবু থেকে সিংহরা আর একজন কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে এবং এক্ষেত্রেও তাবুর পাশেই নির্ভয়ে বসে তাদের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছে.সিংহরা যে কী করে এমন নিঃশব্দে এই পুরু কঁটাঝোপের বেড়া ভেদ করে ভিতরে ঢোকে, আমি কিছুতেই সেটা বুঝে উঠতে পারলুম না। আমার তো বিশ্বাস, শব্দ হোক আর নাই-ই হোক, এর ভিতরে দিয়ে ঢোকাই অসম্ভব! ব্যাপারটা আজ পর্যন্ত আমার কাছে রহস্যের মতোই মনে হয়।

এই ঘটনার পর আমি উপরি উপরি আট-দশ রাত্রি নানা স্থানে সেই দুর্দান্ত পশুদের জন্যে অপেক্ষা করলুম। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হল। হয় আমাকে দেখতে পেয়ে তারা অদৃশ্য হয়, নয় আমার কাছ থেকে অনেক দূরের তাবুতে গিয়ে মানুষ বধ করে! একদিনও তাদের বন্দুকের সীমানার মধ্যে পেলুম না—এদিকে রাতের পর রাত জেগে আমার শরীর রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়ল। তবু আমি হাল ছাড়লুম না, কারণ এতগুলো নিরীহ মানুষ যখন একমাত্র আমাকেই তাদের রক্ষাকর্তা বলে জানে, তখন তাদের রক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোনও কর্তব্য নেই।

বনে-জঙ্গলে বহুকাল কাটিয়েছি, অনেক বিপজ্জনক হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু আমার জীবনে এমন ভয়াবহ সময় আর কখনও আসেনি। রাত্রের পর রাত্রে শুনছি ভয়ংকর নরখাদকের মেঘগর্জনের মতো চিৎকার এগিয়ে আসছে—ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারছি যে, ভোর হবার আগেই আমাদের ভিতর থেকে একজন না একজনকে ইহলোকের সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হবে! সিংহরা যেই তাবুর কাছে আসত, অমনি তাদের চিৎকার থেমে যেত। আর তাদের চিৎকার থামলে আমরা বুঝতুম, তারা শিকারের সন্ধান পেয়েছে, কারণ শিকারের সময়ে সিংহরা একেবারে চুপচাপ হয়ে যায়.তারপরেই সমস্ত স্তব্ধতা চঞ্চল হয়ে উঠত—তাঁবুতে তাঁবুতে মানুষের

উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যেত—'খবরদার! ভেইয়া, শয়তান আতা!' কিন্তু সে সাবধানতায় কোনওই ফল হত না, আবার জেগে উঠত সেই পরিচিত আর্তনাদ এবং পরদিন সকালে নাম ডাকবার সময়ে একজন কুলিকে আর পাওয়া যেত না!

রাত্রের পর রাত্রে বারংবার বিফল হয়ে ক্রমেই আমি হতাশ হয়ে পড়লুম। এ সিংহরা নিশ্চয়ই মায়া সিংহ, নিশ্চয়ই তারা সিংহ-মূর্তিতে সাক্ষাৎ শয়তান জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে তাদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা বৃথা, তাদের কোনও পাত্তই পাওয়া যাবে না; কিন্তু কুলিদের সান্ত্বনা ও ভরসা দেবার জন্যে একটা কিছু তো করতে হবেই। কাজেই প্রতিদিন আমি দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে কখনও হুমড়ি খেয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে সিংহদের খুঁজতে লাগলুম। এই অন্বেষণের সময়ে যদি কোনওদিন তাদের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়ে যেত, তাহলে তাদের চেয়ে আমারই ছিল বিপদের ভয় বেশি,—আমি তাদের কোনও ক্ষতি করবার আগেই তারা হয়তো আমারই ঘাড় ভেঙে সব আপদ চুকিয়ে দিত। এতদিনে সাভোর নরখাদকের ভীষণ কাহিনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অনেক শিকারি ও সৈনিক আমাকে সাহায্য করবার জন্যে সাভোয় এসে হাজির হয়েছিলেন। প্রতি রাতে সবাই বন্দুক নিয়ে পাহারায় বসতেন। কিন্তু ফল হত একই, সিংহরা এমনি চালাক হয়ে উঠেছিল যে, যেদিকে বিপদ সেদিকে কিছুতেই ঘেঁষত না। আমরা যদি পূর্ব দিকে পাহারা দি, তারা তবে মানুষ ধরে পশ্চিম দিকে গিয়ে!

এক রাত্রের কথা স্পষ্ট আমার মনে আছে। রেলস্টেশন থেকে একজন কুলিকে ধরে এনে সিংহরা, আমার তাবুর কাছে এসেই আড্ডা গেড়ে বসল। খেতে খেতে তাদের গজরানি ও সেই সঙ্গে মড়মড় করে হাড় ভাঙার শব্দ এখনও আমি যেন কানে শুনতে পাই! এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক হচ্ছে আমাদের অসহায়তা! বাইরে যাওয়া বৃথা, কারণ যাকে তারা ধরেছে সে-বেচারা আর বেঁচে

নেই এবং চতুর্দিকের অন্ধকার এমন গাঢ় যে, বন্দুক ছুঁড়েও লাভ নেই! আমার তাঁবুর কাছেই যেসব কুলি থাকত, সিংহদের আহারের শব্দে তারা এমনি ভয় পেলে যে, চেঁচিয়ে আমার তাঁবুতে আসবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। আমি সম্মতি দিলুম। তারা এক ছুটে আমার তাঁবুতে এসে হাজির! তখন আমার মনে পড়ল, তাদের দলে এক শয্যাশায়ী রোগী ছিল, তার কথা। তাদের জিজ্ঞাসা করে শুনলুম যে, এমনি তারা হৃদয়হীন, সে-হতভাগ্যকে তাঁবুতে একলা ফেলে রেখে এসেছে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে আনবার জন্যে একদল লোক নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু কুলিদের তাঁবুতে গিয়ে দেখলুম, তাকে আর আমার তাঁবুতে আনবার কোনওই দরকার নেই! কারণ সঙ্গীরা তাকে একলা সেইখানে ফেলে পালাল দেখে ভয়েই তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে!

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠল। এতদিন কেবল একটা নরখাদকই তাঁবুর ভিতরে ঢুকে মানুষ ধরে নিয়ে যেত, তার সঙ্গী অপেক্ষা করত বাইরেই। এখন তারা দুজনে মিলেই তাঁবুতে এসে ঢুকছে এবং প্রত্যেকেই এক-একজন মানুষকে না নিয়ে বাইরে যায় না। মানুষ শিকার খুব সহজ দেখে তাদের বুক বলে গেছে! এইভাবে এক রাত্রে তারা দুজন স্থানীয় লোককে ধরে নিয়ে গেল। একজনকে তারা তখনই উদরসাৎ করে ফেললে, কিন্তু আর একজনের কাতর ক্রন্দনে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ পরে তার ভয়ে আধমরা সঙ্গীরা কোনওরকমে কিঞ্চিৎসাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গিয়ে দেখলে, 'বোমা' জঙ্গলের বেড়ার ভিতরে তার রক্তাক্ত দেহ আটকে রয়েছে। সিংহরা সেই জঙ্গল ভেদ করে তার দেহকে টেনে নিয়ে যেতে পারেনি! হতভাগ্যকে উদ্ধার করে আনা হল বটে, কিন্তু সে বাঁচল না।

এরই দু-চার দিন পরে সিংহরা এক রাত্রে সবচেয়ে বড়ো তাবুর ভিতরে গিয়ে হানা দিলে। দূর থেকে আমি কুলিদের করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলুম কিন্তু কিছুই করতে পারলুম না। ইনস্পেকটার মি. ডলগ্রেন বন্দুক নিয়ে বাইরে এলেন,

এবং অন্ধকারে যেখানে বসে সিংহরা সশব্দে নরমাংস ভক্ষণ করছিল, সেই দিকে উপরি উপরি পঞ্চাশবার বন্দুক ছুঁড়লেন। কিন্তু দুঃসাহসী সিংহরা সে গুলি-বৃষ্টিতেও ভয় পেলে না।

ডলগ্রেন সাহেবের সন্দেহ হল, তিনি একটা সিংহকে আহত করেছেন। পরদিন সকালে তাই তার সঙ্গে আমি আহত সিংহটার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। বালির উপরে সিংহের পদচিহ্ন অনুসরণ করে খানিকদূর অগ্রসর হয়েই একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে বারংবার সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেলুম। খুব সাবধানে জঙ্গল সরিয়ে দেখা গেল, মাটির উপরে একটা কুলির আধ-খাওয়া দেহ পড়ে রয়েছে, কিন্তু সিংহরা সেখান থেকে সরে পড়েছে! সত্যিকথা বলতে কী, এরকম ভয়াবহ ব্যাপারে অশিক্ষিত কুলিরা তো দূরের কথা, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিও স্তম্ভিত না হয়ে পারবে না। সাভোর চারিদিকে তখন পালাও পালাও রব উঠল! কুলিরা দল বেঁধে কাজে কামাই করলে এবং আমার কাছে এসে জানালে যে, আমরা আর কিছুতেই এদেশে থাকব না। ভারতবর্ষ থেকে আমরা এখানে সিংহের ফলার হবার জন্যে আসিনি, আমরা এসেছি সরকার-বাহাদুরের চাকরি করতে।

তারপরেই সাভোতে প্রথম যে-রেলগাড়ি এল, দলে দলে কুলি লাইনের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সে গাড়িখানাকে থামিয়ে ফেললে। এবং তারপরে সকলে মিলে গাড়িতে উঠে কয়েক শত কুলি সেইদিনই এই অভিশপ্ত দেশ ছেড়ে চম্পট দিলে।

লাইনের কাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। বাকি যারা রইল তারা কাজকর্ম করবে কী, সিংহের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে নানা উপায়ের কথা ভাবতে ভাবতেই তাদের সময় কাটতে লাগল। কেউ ছাদের উপরে, কেউ উঁচু জলের ট্যাঙ্কের উপরে গিয়ে আশ্রয় নিলে। কেউ বা তাবুর মাটির ভিতরে গভীর গর্ত খুঁড়ে, গর্তের মুখে ভারী কাঠ চাপা দিয়ে সেইখানেই রাত্রিবাস করে।

সন্ধ্যা হলেই দেখা যায়, বড়ো বড়ো গাছের ডালে ডালে বানরের মতো দলে দলে মানুষ বসে আছে। এক-একটা গাছের ডালে এত লোক বসে থাকত যে, একরাত্রে একটা গাছের ডাল ভেঙে অনেকগুলো লোক সিংহের মুখে গিয়ে পড়ল। ভাগ্যক্রমে সিংহরা তখন অন্য একজন মানুষকে ধরেছিল বলে তাদের দিকে আর ফিরে তাকায়নি; কিংবা গাছ থেকে মানুষ বৃষ্টি দেখে তারা বিস্ময়ে অত্যন্ত চমকে গিয়েছিল!

## চার

ওখানকার ডিস্ট্রিক্ট অফিসার ছিলেন মি. হোয়াইটহেড। কুলিদের ধর্মঘটের কিছু আগে আমি তাঁকে সভোয় এসে সিংহ শিকারে আমাকে সাহায্য করবার জন্যে চিঠি লিখেছিলুম। উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, অমুক তারিখে আমি যাত্রা করব।

তাঁকে ও তাঁর মোটমাট আনবার জন্যে নির্দিষ্ট তারিখে আমি আমার ভৃত্যকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলুম।

খানিকক্ষণ পরেই আমার ভৃত্য ছুটতে ছুটতে ও ভয়ে কাপতে কাপতে ফিরে এল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কী?

সে জানালে যে, স্টেশনে ট্রেনও নেই, রেলের কোনও লোকও নেই, কেবল মস্তবড়ো একটা সিংহ প্ল্যাটফর্মের উপরে নিজের মনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে!

অসম্ভব কথা! আমি হেসেই উড়িয়ে দিলুম। আজকাল এখানকার লোকেরা ভয়ে এতটা ভেবড়ে গেছে যে, জঙ্গলে একটা বেবুন কি হায়না কি কুকুর দেখলেও সিংহ দেখেছে বলে চিৎকার করে ওঠে।

কিন্তু পরদিনই জানা গেল, আমার চাকরের কথা মিথ্যা নয়। সত্য-সত্যই একটা মানুষখেকো সিংহ এসে স্টেশনে হানা দিয়েছিল এবং স্টেশনমাস্টার তার লোকজন নিয়ে ঘরের ভিতরে খিল দিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু তখনও মি. হোয়াইটহেডের দেখা নেই। আমি ভাবলুম, তাহলে এবারে তার আসা আর হল না।

সন্ধ্যার পর আহারে বসেছি, এমন সময়ে দু-বার বন্দুকের আওয়াজ শুনলুম। কিন্তু তাতে আমি ভ্রুক্ষেপ করলুম না, কারণ আজকাল এখানে যখন-তখন বন্দুকের শব্দ শোনা যায়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পর প্রতি রাত্রের মতো আজকেও আমি রাত জাগতে বেরুলুম। একটি গোপন জায়গায় গিয়ে বন্দুক বাগিয়ে বসে রইলুম। একটু পরেই খুব কাছেই শুনলুম, সিংহরা গজরাতে গজরাতে মড়্মড়্ করে হাড় ভেঙে খাচ্ছে! তাবুর ভিতরে কোনও গোলমাল নেই, কেউ আর্তনাদও করছে না, তবে এখানে তারা আর কী খাবার জিনিস পেয়েছে? মনে মনে আন্দাজ করলুম, হয়তো তারা কোনও হতভাগ্য পথিককেই আজ বধ করেছে।

হঠাৎ দেখলুম, অন্ধকারের ভিতরে তাদের অগ্নিময় চোখগুলো জ্বলে উঠল! বেশ টিপ করে বন্দুক ছুড়লুম। তার পরেই সব চুপচাপ। নিশ্চয়ই তারা শিকার নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েছে!

সকালবেলায় তাবুতে ফেরবার পথে মি. হোয়াইটহেডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! তার মুখ বিবর্ণ, চুল উসকো-খুসকো, পোশাক এলোমেলো, যেন তিনি অত্যন্ত পীড়িত।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এ কী ব্যাপার? তুমি এলে কোথেকে? কাল তুমি আসোনি কেন ?

তিনি মুখভার করে বললেন, ভদ্রলোককে নমন্ত্রণ করে তুমি তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে  চমৎকার ব্যবস্থা করে রেখেছ।

—সে কী? হয়েছে কী?

—তোমার সেই হতচ্ছাড়া সিংহ কাল রাতে আর একটু হলেই আমার দফা রফা করে দিয়েছিল!

—কী বাজে বকছ নিশ্চয়ই তুমি কোনও দুঃস্বপন দেখেছ?

হোয়াইটহেড আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার পিঠের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। এটাও কি স্বপ্ন ?

তার জামা গলার কাছ থেকে নীচে পর্যন্ত ছিড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে এবং আদুড় পিঠের উপরে চার-চারটে ধারালো নখের রক্তাক্ত দাগ দেখা যাচ্ছে। নির্বাক হয়ে তাকে নিয়ে আমি তাবুতে ফিরে এলুম। তার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলুম। তারপর তার মুখ থেকে যা শুনলুম, তা হচ্ছে এই –

কাল আমি যখন সাভো স্টেশনে এসে হাজির হলুম, তখন রাত হয়ে গেছে। সঙ্গে ছিল আমার চাকরদের সর্দার আবদুল্লা। আমি তোমার তাবুতে আসবার পথ ধরলুম—পিছনে পিছনে লণ্ঠন নিয়ে আসতে লাগল আবদুল্লা। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড সিংহ কোথেকে এক লাফে আমার ঘাড়ের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বিষম ধাক্কায় আমি ছিটকে মাটির উপরে দড়াম করে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলুম।

সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকটা তখনও আমার হাতেই ছিল, আমি তখনই সিংহকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়লুম।

গুলি সিংহের গায়ে লাগল না বটে, কিন্তু বন্দুকের আগুন ও আওয়াজ দেখে-শুনে সিংহটা হতভম্ব হয়ে গেল! সেই সুযোগে আমি একলাফে সরে দাঁড়ালুম।

কিন্তু সিংহ তখন আবদুল্লাকে আক্রমণ করলে। সে বেচারা চিৎকার করে উঠল, হুজুর, সিংহ তারপরে সে আর কিছু বলবার সময় পেলে না, কারণ সিংহ তাকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আবার বন্দুক ছুড়লুম, কিন্তু কোনওই ফল হল না?

এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলুম যে, কাল রাত্রে সিংহরা কোন হতভাগ্যের মাংস ভক্ষণ করছিল!

সেইদিনেই ওখানকার পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট কার্কুহার সাহেবও একদল সেপাই নিয়ে সিংহ-শিকারে আমাকে সাহায্য করতে এলেন। এবং আরও কয়েকজন সাহেব নানা স্থান থেকে সাভোয় এসে হাজির হলেন। সিংহদের কুখ্যাতি তখন দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিংহের বিরুদ্ধে মানুষের এই বিপুল যুদ্ধ ঘোষণার কথা সিংহরা টের পেয়েছিল কি না জানি না,—জানলে দুরাত্মাদের পেটের পিলে নিশ্চয়ই চমকে যেত! এবারে আমরা আঁট-ঘাট বেঁধে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলুম। আমি যে একটি সিংহ ধরবার ফাঁদ তৈরি করেছি, পূর্বেই সে কথা বলা হয়েছে। সেই ফাদটি একটি যুৎসই জায়গায় এনে রাখলুম। তার ভিতরের একটি কামরায় রইল দুজন সশস্ত্র সেপাই! মানুষ খাবার লোভে সিংহরা ভিতরে ঢুকলেই ফঁাদের অন্য ঘরে বন্দি হবে, অথচ মানুষের ঘরে আসতে পারবুে না।

গাছে গাছে বন্দুক নিয়ে অন্যান্য সেপাইরা পাহারায় রইল। সাহেবরাও প্রস্তুত হয়ে ঝোপেঝাপে লুকিয়ে রইলেন।

রাত নটা বাজল। এখন পর্যন্ত চারিদিক একেবারে নিসাড় হয়ে আছে।

আচম্বিতে একটা শব্দ হল। বুঝলুম, আমার ফাঁদের ভারী দরজা ঝপাং করে পড়ে গেল। আনন্দে প্রাণ নেচে উঠল!

উঃ এতদিনে! এতদিনে অন্তত একটা শয়তানকেও বাগে পাওয়া গেল।

কিন্তু শেষে দেখা গেল, সবই ফক্কিকার! সিংহ এসেছিল, ধরা পড়েছিল, কিন্তু তবু তাকে খাঁচার ভেতরে পাওয়া গেল না! বুঝুন, এ কত বড়ো দুর্ভাগ্য!

খাঁচার ভিন্ন কামরায় যে দুজন সেপাই ছিল, তাদের উপরে হুকুম ছিল যে, সিংহ ধরা পড়লেই তারা তাকে বধ করবে।

কিন্তু ভীষণ সিংহ যখন পিঞ্জরে বন্দি হয়ে গর্জন ও লম্ফত্যাগ করতে লাগল, তখন সেপাইরা আতঙ্কে এমনি আড়ষ্ট হয়ে গেল যে, বন্দুক ছোড়ার কথা আর তাদের মনেই রইল না।

কাছেই এক জায়গায় ছিলেন ফার্কুহার সাহেব, ব্যাপার বুঝে সেইখানে থেকেই তিনি চেঁচিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে লাগলেন।

তখন তারা মরিয়া হয়ে বিপুল-বিক্রমে বন্দুক ছুড়তে শুরু করলে!

সে কি যে সে বন্দুক ছোড়া, অন্ধ বা পাগলরাও তেমন ভাবে বন্দুক ছেড়ে না! আকাশে, বাতাসে, আমাদের আশে পাশে, মাথার উপরে গুলির ঝড় বইতে লাগল—প্রাণ যায় আর কী! বন্দুকের গুলির চোটে ফাঁদের দরজার খিল গেল উড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সিংগি দিলে দেচম্পট! একেবারে পাশ থেকে এমন রাশি রাশি গুলি ছুড়লে যে কোনও দুর্দান্ত একবার নয়, দশ-বারো বার মরতে পারত। তবু যে সেপাইরা কেন তাকে বধ করতে পারলে না, এটা একটা অসম্ভব রহস্যের ব্যাপার! খাঁচার ভিতরে রক্ত দেখে বোঝা গেল, সিংহটা আহত হয়েছে বটে ! কিন্তু এ তুচ্ছ সান্ত্বনার ব্যাপার, কারণ তার মৃত্যু ছিল নিশ্চিত!

তবু আমরা একেবারে হাল ছাড়লুম না, সকালবেলায় দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে, বনে বনে সিংহের খোঁজ করতে লাগলুম। মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর থেকে পশুরাজের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল,—কিন্তু ওই পর্যন্ত! তার দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য আর হল না, কেবল ফাকুঁহার সাহেব একটা সিংহকে একবার বিদ্যুতের মতো এ-জঙ্গল থেকে ও-জঙ্গলে চলে যেতে দেখেছিলেন।

এইভাবে দু-দিন কাটল। সিংহ কিন্তু দেখা দিতে রাজি হল না। ফার্কুহার সাহেব তখন হতাশ হয়ে তার সেপাইদের নিয়ে চলে গেলেন। মি. হোয়াইটহেড ও অন্যান্য সাহেবরাও একে একে বিদায় গ্রহণ করলেন।

আবার আমি একলা! বুঝলুম, এখন থেকে আমাকে আবার এক-একই নরখাদক সিংহদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে!

# পাঁচ

দিন-দুই পরের কথা। সকালবেলায় বাইরে বেরিয়েই দেখি, একজন 'সোয়াহিলি' (স্থানীয় অসভ্য বাসিন্দা) মহাভয়ে ছুটতে ছুটতে চ্যাঁচাচ্ছে 'সিম্বা! সিম্বা!' (সিংহ! সিংহ) এবং বারংবার পিছনপানে তাকিয়ে দেখছে!

তাকে প্রশ্ন করে জানলুম যে, নদীর ধারের তাবুর ভিতর থেকে সিংহরা একজন মানুষ ধরতে গিয়ে ধরতে পারেনি; তখন তারা একটা গাধাকে বধ করে সেইখানেই বসে বসে ভোজন করছে!

হুঁ, এই হল আমার সুযোগ! এ সুযোগ কি আর ছাড়ি?

একছুটে তাবুতে ফিরে, ফার্কুহার সাহেব যে বৃহৎ বন্দুকটা রেখে গিয়েছিলেন সেটা তুলে নিয়েই বেরিয়ে পড়লুম। সোয়াহিলি আগে আগে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। খুব সন্তপর্ণে এগুতে লাগলুম—এবারে এসপার কি ওসপার!

খানিক পরেই ঘন ঝোপের ফাক দিয়ে দেখা গেল একটা সিংহকে।

দুর্ভাগ্যক্রমে সোয়াহিলির পা পড়ল একটা খড়মড়ে শুকনো ডালের উপরে গিয়ে। সুচতুর পশুরাজ তখনই সে-শব্দটা শুনতে পেলে এবং একবার গজরে উঠেই আরও ঘন জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাছে বাগে পেয়েও আবার তাকে হারাই, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি আমি তাঁবুতে ফিরে এলুম। সেখানে যত কুলি ছিল সবাইকে ডেকে এনে এক জায়গায় জড়ো করলুম এবং বললুম, যত ঢাক ঢোল আর টিনের কানাস্তারা আছে, সব নিয়ে তোমার আমার সঙ্গে এসো।

যে-জঙ্গলে সিংহটা অদৃশ্য হয়েছিল, দল বেঁধে আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। কুলিদের জমাদারকে বললুম, জঙ্গলের ওপাশে যাচ্ছি আমি। তোমার লোকজনকে এই জঙ্গলের এপাশ থেকে তিন দিক ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়

করাও। আমি ওপাশে গিয়ে পৌছেলেই তোমরা সবাই মিলে ঢাক-ঢোল আর কানাস্তারা বাজিয়ে বিষম গোলমাল শুরু করে দেবে!

গুড়ি মেরে আমি জঙ্গলের ওপাশে গিয়ে হাজির হলুম। জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা পথ বেরিয়ে এসেছে, তারই সামনে একটা টিপির পিছনে গিয়ে আমি গা-ঢাকা দিলুম।

একটু পরেই একসঙ্গে অসংখ্য ঢাক-ঢোল আর কানাস্তারার আকাশ-ফাটানো ও বনকাপানো বাজনা আরম্ভ হল, সেই সঙ্গে আবার ভৈরব চিৎকার করতে করতে সমস্ত কুলি যখন পায়ে পায়ে এগুতে সুরু করলে, তখন সেই হই-হই রবে আমারই কান যেন কালা হয়ে যাবার জোগাড় হল! কোনও ভদ্র সিংহই এ গোলমাল সইতে পারবে না বুঝে আমি প্রস্তুত হয়ে রইলুম।

যা ভেবেছি তাই! মহা আনন্দে দেখলুম, একটা মস্তবড়ো, বলবান ও কেশরহীন সিংহ দ্রুতপদে জঙ্গল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। আজ কয়েক মাস ধরে এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম ও এত নরহত্যার পরে অন্তত একটা শয়তান এই প্রথম আমার কবলে এসে পড়ল! আর ওর রক্ষা নাই!

ধীরে ধীরে সিংহটা এগুচ্ছে এবং বারবার অবাক হয়ে চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে, তার রাজত্বে হঠাৎ এ অশান্তির কারণ কী? এই গোলমালেই সে অন্যমনস্ক হয়ে আছে, নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে আমাকে দেখে ফেলত, কারণ ঢিপির আড়ালে আমার সব দেহটা ঢাকা পড়েনি। সে যখন আমার কাছ থেকে মাত্র পনেরো গজ তফাতে, আমি তখন বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করে ফেললুম—

এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পড়ে গেল আমার উপরে—

আচম্বিতে আমাকে যেন মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠতে দেখে অত্যন্ত হতভম্ব হয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং গরর-গরর করতে লাগল।

আর কোথায় পালাবে যাদু? এই না ভেবে তার মাথা টিপ করে দিলুম আমার বন্দুকের ঘোড়া টিপে!

কী সর্বনাশ! টোটার বারুদ যে জ্বলে গেল—গুলি যে ছুটল না—পরের বন্দুক নিয়ে এ কী বিপদ!

এই অভাবিত দুর্ঘটায় আমি এমন স্তম্ভিত হয়ে পড়লুম যে, বন্দুকের দ্বিতীয় নলচের ঘোড়া টেপার কথা ভুলেই গেলুম! বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামালুম, যদি সময় পাই, আবার তাতে টোটা ভরে ফেলব।

সৌভাগ্যক্রমে ঢাক-ঢোল কানাস্তারার আওয়াজে ও কুলিদের চিৎকারে সিংহটা এমনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, আমার দিকে সে আর নজর দেবার সময় পেলে না। নইলে এ-যাত্রায় আমার প্রাণ নিশ্চয়ই বাঁচত না! সে আমাকে আক্রমণ না করে একলাফে আবার জঙ্গলের ভিতর গিয়ে পড়ল! এবং এতক্ষণে আমার আবার হুঁস হল, আমি আবার বন্দুক তুলে দ্বিতীয় নলচের গুলি ছুড়লুম! সঙ্গে সঙ্গে সিংহের গজরানি শুনেই বুঝলুম, আমি লক্ষ্যভেদ করেছি!

কিন্তু আসলে কোনও সুফলই ফলল না। আহত সিংহ আবার পালাল, তার পিছনে ছুটেও আর তাকে ধরতে পারলুম না।

বিষম খাপ্পা হয়ে আমি বন্দুককে, যার বন্দুক এবং যে এই বন্দুক তৈরি করেছে তাদের যা-মুখে আসে তাই বলে গালাগালি দিতে লাগলুম। এরপর আর কোনও দিন আমি এই বন্দুকটা ব্যবহার করিনি।

তখনকার মতো আবার তাঁবুর দিকে ফেরা ছাড়া আর উপায় রইল না। বার বার দুর্ভাগ্যে ও অসাফল্যে মন আমার ভেঙে পড়ল। এবং কুলিদেরও কুসংস্কার আরও দৃঢ় হয়ে উঠল—এখানকার সিংহরা মায়াসিংহ না হয়ে যায় না! সত্যি, অনেকটা সেই রকমই বটে, এ সিংহদের উপরে কে যেন মন্ত্র পড়ে দিয়েছে, বন্দুকের গুলি এদের কিছুই করতে পারে না।

# ছয়

সিংহরা যে-গাধাটাকে বধ করেছে, তাকে খেয়ে ফেলবার আগেই আমরা যে গিয়ে পড়েছিলুম, এটা আমি ভুলিনি। এবং তারা যে গাধার মাংস খাবার লোভে আবার ফিরে এলেও আসতে পারে, এটাও আমার অজানা ছিল না।

গাধার দেহটা যেখানে পড়ে আছে, তার কাছে কোনও গাছটাছ ছিল না। তাই সেখানে আমি চারটে বড়ো বড়ো ডান্ডা পুতে তার উপরে তক্তা পেতে একটা বারো ফিট উচু মাচা বানিয়ে ফেললুম। এবং একটা খোটা পুঁতে তার সঙ্গে একগাছা মোটা দড়ি জড়িয়ে গাধার দেহটা এমন ভাবে বেঁধে রাখলুম যে সিংহরা সহজে সে দেহটা টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

সূর্য যেই আস্তে গেল, আমিও অমনি মাচার টঙে চড়ে বসলুম এই আশায় যে, যদি সিংহরা আবার ভুল করে আমার ফাঁদে পা দেয়!

অন্ধকার নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে অসীম স্তব্ধতা! আফ্রিকার অরণ্যে অন্ধকার নিশীথের স্তব্ধতা যে কী রকম, লিখে তা বুঝানো যায় না, প্রাণ দিয়ে তাকে অনুভব করতে হয়। বিশেষ, আমার মতন অবস্থায়,—একাকী ও সঙ্গীরা আছে কত দূরে!

নির্জনতা, নীরবতা ও যে-জন্যে আমি এখানে বসে আছি তার ভাবনা, এই সমস্তরই প্রভাব আমার চিত্তকে কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন করে তুললে! উপরে আকাশ, অন্ধকার সেখানে খুব জমাট নয়, চারপাশে বন-জঙ্গল, অন্ধকারের উপরে সেখানে যেন অন্ধকারের আর একটা প্রলেপ পড়েছে এবং সামনে খোলা জমি, অন্ধকার সেখানে যেন একলাটি শুয়ে আছে। কোথাও একটা পাখি ডাকছে না, বাতাসের দোলায় পাতা শিউরে উঠছে না!

ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠলুম! যেন শুকনো পাতা মড়মড় করে উঠল না? কান পেতে রইলুম—বনের ভিতরে কোনও দানবের পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে! ও শব্দটা কীসের? নরখাদক সিংহের? নিশ্চয়ই আজ আমার ভাগ্য ফিরবে?

আবার সেই গম্ভীর স্তব্ধতা! প্রাণপণে অন্ধকারের ভিতরে দৃষ্টিকে চালিয়ে বন্দুক ধরে আমি বসে রইলুম একটা পাথরের মূর্তির মতো!

একটু পরেই সকল সন্দেহ ঘুচে গেল! হ্যাঁ, পশুরাজেরই আবির্ভাব হয়েছে। ওই গভীর দীর্ঘশ্বাস, ওটা হচ্ছে ক্ষুধার চিহ্ন। ওই তো! জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাবধানে সে এগিয়ে আসছে, তারই শব্দ হচ্ছে!

এক মুহূর্তের জন্যে সমস্ত স্থির, তার পরেই ক্রুদ্ধ গর্জন! পশুরাজের চোখে ধুলো দেওয়া অসম্ভব, সে টের পেয়েছে যে আমি এখানে সশরীরে উপস্থিত!...তাই তো, সে কি আবার আমাকে ফাঁকি দেবে?

না! চাকা ঘুরে গেল, ব্যাপারটা হঠাৎ অন্য রকম হয়ে দাঁড়াল! আমি এসেছি সিংহ শিকার করতে, কিন্তু সিংহই এখন আমাকে শিকার করতে চায়! সে কি বুঝতে পেরেছে যে, আমিই হচ্ছি প্রধান শত্রু?

সিংহটা গাধার দিকও মাড়াল না, সে চোরের মতো আমার মাচার চারিপাশে ওত পেতে ঘুরে বেড়াতে লাগল! প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে এই ব্যাপার চলল—ধীরে ধীরে সে মাচার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে তাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না বটে, কিন্তু তার পায়ের শব্দে সমস্তই আন্দাজ করতে পারছিলুম! আমার এই নড়বোড়ে মাচা, এমন কাণ্ড হতে পারে সেটা না ভেবেই এটা তৈরি করা হয়েছে, বলিষ্ঠ সিংহের প্রথমই আক্রমণেই মাচাসুদ্ধ আমাকে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হবে—এবং তারপর?

আর এই তো মোটে বারো ফিট উঁচু মাচা, সিংহ যদি একলাফে এর উপরে উঠে পড়ে, তা হলেই বা আমার দশা কী হবে?

..আমার বুক দুর্ভাবনায় ধড়ফড় করতে লাগল, বোকার মতো নিজের মৃত্যুকে নিজেই ডেকে এনেছি ভেবে মনে মনে অনুতাপ করতে লাগলুম।

যতই ভয় পাই, আমি কিন্তু একেবারে স্থির হয়ে বসে রইলুম! দৃষ্টি আমার নিস্পলক!

আচম্বিতে আমার মাথার পিছনে ঝপাং করে কে আঘাত করলে!

পরমুহূর্তে ভীষণ আতঙ্কে অবশ হয়ে মাচার উপর থেকে আমি পড়ে যাচ্ছিলুম—সিংহটা নিশ্চয়ই পিছন দিক থেকে লাফ মেরে আমার মাচার উপরে উঠে এসেছে!

কোনও রকমে সামলে গেলুম! না, সিংহ নয়,—একটা প্যাঁচা! আমার স্থির দেহকে গাছের ডাল বা অমনি কিছু বলে ভুল করেছে। অতি সাধারণ ব্যাপার! উল্লেখযোগ্যই নয়! কিন্তু সময় বিশেষে সাধারণ ব্যাপারও কতখানি ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে!

প্যাঁচার ডানার ঝাপটায় যেই আমি চমকে উঠলুম, নীচে থেকে দুরন্ত সিংহটও অমনি রেগে গোঁ গোঁ করে উঠল!

আবার আমি স্থির হয়ে বসলুম-- যদিও মনের ভিতর দিয়ে আমার উত্তেজনার স্রোত বয়ে চলেছে! সিংহটা আবার চোরের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার পায়ের শব্দ শুনলুম এবং অন্ধকারের ভিতরেও নিবিড়তর অন্ধকারের মতো তার দেহটা আমার সামনে জেগে উঠল!

আর তাকে এগুতে দেওয়া উচিত নয়। যেটুকু দেখেছি সেইটুকুই যথেষ্ট।

আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম।

বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সিংহের সে কী ভয়ঙ্কর চিৎকার! একটা অন্ধকারের চেয়েও কালো ছায়া বিপুল এক লম্ফে দূরের ঝোপের উপরে ঠিকরে গিয়ে পড়ল—তারপর চারিদিকে লাফালাফি করতে লাগল—আমি আর কিছু আন্দাজ করতে পারলুম না—কেবল গুলির পর গুলি বৃষ্টি করতে

লাগলুম!...তারপর ঘন ঘন আর্তনাদ, তারপর বার বার গভীর শ্বাস, তারপর আবার সব চুপচাপ! আমি বেশ বুঝলুম অন্তত একটা নরহন্তা শয়তানের লীলাখেলা জন্মের মতো ফুরিয়ে গেল!

কিন্তু একসঙ্গে এই বন্দুকের ও সিংহের গর্জন স্তব্ধ রাত্রে আমাদের তাবুর ভিতরে গিয়ে পৌঁছতে দেরি লাগল না। সারা অরণ্য শত শত মানুষের কণ্ঠস্বরে জাগ্রত হয়ে উঠল! দূর থেকে প্রশ্ন আসতে লাগল—ব্যাপার কী, আমার কি কোনও বিপদ হয়েছে?

চিৎকার করে আমি জানালুম,—না, আমার কোনও বিপদ হয়নি, কিন্তু একটা মানুষখেকো দানব মারা পড়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে শত শত মানুষ এমন সমস্বরে গগনভেদী জয়ধ্বনি করে উঠল যে, সেই বিরাট অরণ্যের সমস্ত পশু বোধহয় অত্যন্ত বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ল!

জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল, শত শত আলো ছুটোছুটি করতে করতে এগিয়ে আসছে, অনেকে ঢোল বাজাচ্ছে এবং অনেকে বাজাচ্ছে শিঙা—তাঁবু খালি করে এক বিরাট জনতা আমার কাছে এসে পড়ল!

আমি সবিস্ময়ে দেখলুম, দলে দলে লোক এসে আমার সামনে নীচু হয়ে মাথা নামিয়ে অভিভূত স্বরে বলছে, হুজুর, আপনি গরিবের মা-বাপ!—আপনি ঈশ্বর-প্রেরিত!— আপনিই আমাদের রক্ষাকর্তা!

তারা তখনই মরা সিংহটাকে ঝোপের ভিতর থেকে টেনে বার করতে চায়! কিন্তু আমি বাধা দিলুম! কী জানি, হয়তো সিংহটা কেবল আহত হয়েছে, হয়তো এখনও সে মরেনি, কেউ কাছে এগুলে হয়তো এখনও সে লাফ মেরে তার ঘাড় ভাঙতে পারে! আহত সিংহ অত্যন্ত সাংঘাতিক জীব!

অতএব সে-রাত্রের মতো সকলকে নিয়ে আমি খুশি মনে আবার তাঁবুতে ফিরে এলুম। ছাউনির ভিতরে সারারাত ধরে মহা উৎসব, জয়ধ্বনি ও নাচ-গান চলল।

প্রভাতের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে আমি বসে রইলুম। এবং ভালো করে ফরসা হতে না হতেই আমি সদলবলে আহত বা নিহত সিংহটার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম।

মাটির উপরে রক্তের দাগ দেখে সেই দাগ ধরে আমরা একটা ঘন ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করলুম। কিন্তু কয়েক পা এগুতে না-এগুতেই আমাদের সামনে ও কী ও —একটা প্রকাণ্ড সিংহ আমাদের উপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে গুড়ি মেরে আছে!

বুকটা ছাৎ করে উঠল! কিন্তু তারপরেই বুঝলুম,—না, সিংহটা জ্যান্ত নয়, ওই অবস্থাতেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে!

কুলিদের আনন্দ দেখে কে! আমাকে তাদের কাঁধে তুলে নিয়ে, তারা হাসতে হাসতে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে মৃত সিংহটার চারপাশ ঘিরে নাচতে আরম্ভ করলে!

আনন্দের প্রথম উচ্ছাস একটু শান্ত হবার পরেই সিংহের দেহটাকে আমি পরীক্ষা করে দেখলুম। হ্যাঁ, এরকম সিংহ বধ করতে পারা ভাগ্যের কথা বটে। মাথায় সে তিন ফুট নয় ইঞ্চি উঁচু ও লম্বায় হচ্ছে নয় ফুট আট ইঞ্চি এবং তার দেহটাকে তাবুতে বয়ে আনবার জন্যে আট-আট জন বলবান কুলির দরকার হয়েছিল!

এই প্রথম নরখাদকের মৃত্যু-সংবাদ দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়তে দেরি লাগল না। স্বচক্ষে তার গা থেকে ছাড়ানো চামড়াটা দেখাবার জন্যে বহুদূর থেকে অসংখ্য কৌতুহলী লোক আমার তাবুর কাছে এসে ভিড় করতে লাগল।

# সাত

প্রথম নরখাদকের মৃত্যুর পরই আমরা যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম, এ-কথা কেউ যেন মনের কোণেও ঠাঁই না দেন।

দ্বিতীয় নরখাদক যে এখনও বেঁচে আছে, এ সত্য আমরা ভুলিনি। ভোলবার উপায়ও ছিল না। কারণ কিছুদিন যেতে না যেতেই সে নিজেই এসে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তুললে।

রেলপথের ইনস্পেকটার এক রাত্রে নিজের বাংলোর ভিতরে বসে আছেন, হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে একটা শব্দ এল—কে যেন সেখানে দুম দুম করে পা ফেলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে! ইনস্পেকটার ভাবলেন, বোধ হয় কোনও কুলি অতিরিক্ত মাতাল হয়ে বারান্দায় এসে গোলমাল করছে! তিনি রেগে-মেগে ধমক দিলেন, ভাগো হিয়াসে?

ভাগ্যে তিনি দরজা খুলে বাইরে আসেননি! কারণ বারান্দার উপরে ওঁত পেতে বসেছিল, একটা সিংহ! মানুষ ধরতে না পেরে সিংহটা তখন নাচার হয়ে ইনস্পেকটারের দুটাে পোষা ছাগলকে বধ করলে। এবং সেইখানে বসে-বসেই ছাগলদুটোকে পেটে পুরে তবে বিদায় হল।

খবর পেয়ে তখনই আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলুম। সমস্ত দেখে-শুনে স্থির করলুম, সিংহের শুভাগমনের জন্যে আজকের রাতটা আমি এইখানেই কাটিয়ে দেব।

কাছেই একটা খালি লোহার ঘর ছিল এবং তার দেওয়ালে ছিল একটা গর্ত—যেখান দিয়ে বন্দুক ছোড়বার খুব সুবিধা! সন্ধ্যার আগেই ঘরের বাইরে বেঁধে রাখা হল তিনটে ছাগল এবং ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম আমি ছাগলগুলো বাধা রইল একটা আড়াই মন ভারী রেলের সঙ্গে।

প্রায় সারা রাত কেটে গেল অত্যন্ত নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে। ভোর যখন হয়-হয়, তখন হঠাৎ শুনতে পেলুম, ছাগল তিনটের সঙ্গে সেই ভারী রেলটা কে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! এ সিংহ না হয়ে যায় না! গর্তের ভিতরে বন্দুকের নল চালিয়ে তখনই তার উদ্দেশে ঘন ঘন গুলিবৃষ্টি করলুম—কিন্তু অন্ধকারে আমার সমস্ত গুলিই ব্যর্থ হল।

সকাল হলে পর দলবল নিয়ে আমি সিংহের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। মাটির উপরে ছাগল ও রেল টেনে নিয়ে যাবার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে, সুতরাং সিংহটা কোন দিকে গেছে তা বুঝতে আমাদের কোনওই কষ্ট হল না।

প্রায় একপোয়া পথ পার হয়েই শোনা গেল, একটা ঝোপের আড়াল থেকে সিংহের গর্জন! আমরা সেই ঝোপটার দিকে এগুতে লাগলুম। সিংহটা তখন খাপ্পা হয়ে আমাদের দিকে ছুটে এল—কিন্তু জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরুল না। তাকে ছুটে আসতে দেখেই আমার সঙ্গের লোকজন যে যেদিকে পারলে চম্পট দিলে, কেবল মি. উইঙ্কলার ছাড়া।

খানিক পরে সিংহের আর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ঝোপের ভিতরে আমরা ইট পাটকেল ছুঁড়তে লাগলুম। তবু সব চুপচাপ। তারপর উঁকিঝুঁকি মেরেই বেশ বোঝা গেল, সিংহ আর সে-অঞ্চলে নেই, আমাদের ভয় দেখিয়েই সে সরে পড়েছে। তিনটে ছাগলের ভিতরে মাত্র একটাকে সে সাবাড় করতে পেরেছে।

অসমাপ্ত ফলারের লোভে সিংহটা হয়তো আবার ফিরে আসবে।—এই ভেবে আমি সেইখানেই খুব উঁচু একটা মাচান খাড়া করালুম এবং রাতের অন্ধকার নামবার আগেই তার উপরে চড়ে বসলুম। কিন্তু আবার আজকের রাতটা একেবারে অনিদ্রায় কাটাবার শক্তি আমার ছিল না। তাই আমার বন্দুক-বাহক মহিনাকেও সঙ্গে রাখলুম—পালা করে রাত জাগবার জন্যে।

মাচানের উপরে শুয়ে আমি ঢুলছিলুম। হঠাৎ মহিনা আমার হাত টেনে ধরে চুপিচুপি বললে, ‘সিংহ!’

এক লহমায় আমার তন্দ্রা গেল ছুটে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বন্দুকটা চেপে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটা ঝোপ সশব্দে দুলে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা সিংহ খুব সন্তপণে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে মরা ছাগলদুটোর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

সিংহটা যখন প্রায় আমার মাচানের নীচে এসে পড়ল, তখনই আমি একসঙ্গে বন্দুকের দুটাে নলের গুলিই ত্যাগ করলুম। সানন্দে আমি দেখলুম, দু-দুটাে গুলির চোটে সিংহটা তখনই মাটির উপরে আছড়ে পড়ল। একেবারে তাকে সাবাড় করবার জন্যে তাড়াতাড়ি আমি আর একটা বন্দুক নেবার জন্যে ফিরলুম—কিন্তু সেই ফাকে সিংহটা চটপট উঠে পড়ে সাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল—তার দিকে বারংবার গুলি ছুড়েও কোনও ফল হল না।

কিন্তু সিংহটা যখন রীতিমতো জখম হয়েছে, তখন কাল সকালে তাকে যে আবার খুঁজে বার করতে পারব, এ বিশ্বাস আমার ছিল—তাই হতাশ হয়ে পড়লুম না।

সকালের আলো যেই পদ্মের মতো পবিত্র শুভ্রতা নিয়ে পূর্বকাশে ফুটে উঠল, অমনি আমাদেরও খোঁজা শুরু হল। আধ-ক্রোশ পর্যন্ত মাটির উপরে রক্তের দাগ পাওয়া গেল। কিন্তু তারপরেই এল শুকনো পাহাড়ে-জমি, রক্তের দাগ সেখানে এরই মধ্যে শুকিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে।

মিছেই হল আমাদের সমস্ত খোঁজাখুঁজি, পলাতক সিংহের আর কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না।

এর পর একে একে দশ দিন কাটল, পশুরাজের কোনওই সন্ধান নেই। আমরা মনে মনে এই ভেবে আশ্বস্ত হলুম যে, আহত সিংহটা হয়তো বনের ভিতরেই অক্কা লাভ করেছে। তবু বলা তো যায় না, কুলিদের বলে দিলুম রাত্রিবেলায় খুব সাবধানে থাকতে।

কথায় বলে, সাবধানের মার নেই! ভাগ্যিস কুলিরা আমার উপদেশ শুনেছিল!

কারণ এক রাত্রে তাঁবুর ভিতর থেকে হঠাৎ শুনলুম, বাইরের গাছের উপর থেকে একদল কুলি মহা আতঙ্কে চিৎকার করছে!

চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কী? উত্তরে শুনলুম, একটা সিংহ তাদের ধরবার জন্যে গাছের উপরে চড়বার চেষ্টা করছে!

চাঁদ তখন মেঘে ঢাকা পড়েছে—চারিদিকে পিচের মতো কালো অন্ধকার। এ সময়ে তাবুর বাইরে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা, একই কথা! কাজেই সিংহটাকে ভয় দেখাবার জন্যে তাবুর ভিতর থেকেই বারকয়েক বন্দুক ছুড়লুম। ফলে, সে আহত না হলেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। সে আর গাছে চড়বার চেষ্টা না করে পালিয়ে গেল!

পরদিন প্রভাতে শুনলুম, কেবল গাছ নয়, সিংহটা প্রত্যেক তাবুর ভিতরেই মাথা গলাবার চেষ্টা করেছিল! বিষম তার আস্পর্ধা!

আবার যদি পশুরাজ ক্ষুধার চোটে এদিকে আসে, এই আশায় আমি সেই কুলিদের গাছে উঠে আজকের রাতটা কাটাব বলে ঠিক করলুম।

সন্ধ্যার সময়ে গাছে উঠছি, হঠাৎ একটা ডাল থেকে একটা বিষধর সপ ফোশ করে উঠল—আমিও তড়াক করে মাটিতে এসে অবতীর্ণ হলুম।

একজন কুলি একটা লম্বা ডান্ডার চোটে সাপটার কামড়াবার সাধ তখনই মিটিয়ে দিলে। সে রাত্রি ছিল খুবই সুন্দর-আকাশে মেঘ নেই, চাদের আলোয় চারিদিক ধবধব করছে—সমস্ত বনটাকে দেখাচ্ছে একখানি চমৎকার ছবির মতো।

রাত দুটো পর্যন্ত আমি জেগে রইলুম। তারপর মহিনীর হাতে বন্দুক দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম।

গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে দিব্য আরামে ঘুমোচ্ছি, আচম্বিতে কেন জানি না, আমার ঘুম গেল ভেঙে !

মহিনাকে শুধোলুম, সে সন্দেহজনক কিছু দেখেছে কি না! মহিনা বললে, না। চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে আমিও কিছু আবিষ্কার করতে পারলুম না। আশ্বস্ত হয়ে আবার নিদ্রাদেবীকে ডাকবার উপক্রম করছি, হঠাৎ মনে হল, দূরের ওই নীচু ঝোপের কাছে কী যেন একটা নড়ে উঠল!

ভালো করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকেই বুঝলুম, না—আমার ভুল হয়নি! সিংহই বটে। সে-ও আমাদের লক্ষ করছে!

হতভাগার সাধ, আমাদের ধরে পেটের ভিতরে পোরে। সেই আশায় সে চোরের মতো এ-ঝোপ থেকে টপ করে ও-ঝোপে গিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে! পরিষ্কার চাদান রাত। তার সমস্ত লুকোচুরিই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটুকু তার মাথায় ঢুকল না! তার ভাবভঙ্গি দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে, মানুষ-শিকারের ভীষণ খেলায় সে খুবই ওস্তাদ।

আমি আর ইতস্তত করলুম না, কী-জানি দেরি করলে সে যদি আবার আমাদের ফাঁকি দেয়! যখন সে আমাদের কাছ থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে আছে, তার বুক টিপ করে তখনই আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম। গুলি যে তার বুকে গিয়ে লাগল, এও আমি বুঝতে পারলুম, কিন্তু গুলি খেয়েই সে লাফাতে লাফাতে পালাতে লাগল। উপরি উপরি আরও তিনবার বন্দুক ছুড়লুম, এবং আবার তার আর্ত গর্জন শুনে বুঝতে পারলুম যে, আমার শেষ গুলি ঠিক তার গায়ে লেগেছে! কিন্তু তবু সে মাটিতে কুপোকাত হল না—জঙ্গলের ভিতরে কোথায় মিলিয়ে গেল!

অধীর ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলুম—কখন ভোর হয়, কখন ভোর হয়! রাত কাটল। আমিও গাছ থেকে নামলুম। মহিনা এবং আর একজন লোককে নিয়ে আমি চললুম আহত সিংহের খোঁজে।

মাটির উপরে রক্তের রেখা! পথ ভোলবার সম্ভাবনা নেই। বেশিদূর এগুতে হল না। জঙ্গলের ভিতরে খুব কাছেই ওই তো সিংহের গর্জন! ঝোপঝাপের ফাক দিয়ে উকি মেরে দেখলুম, সিংহটা আমাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে গরর গরর করছে—তার ভয়ানক দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে!

সাবধানে লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছুড়লুম—পরমুহূর্তে কান-ফাটানো ও প্রাণ-কাপানো চিৎকার করে আমাদের উপরে সে ঝাপিয়ে পড়ল!

আবার আমি বন্দুক ছুড়লুম—গুলির চোটে মাটিতে ঠিকরে পড়েই আবার সে দাঁড়িয়ে উঠল এবং প্রচণ্ড বেগে হা করে আমাদের দিকে ধেয়ে এল—মূর্তিমান মৃত্যুর মতো!

ফের গুলি ছুড়লুম—কিন্তু তবু সে দুর্দান্ত সিংহের গতিরোধ হল না। এ সিংহ কি অমর?

আমার পাশেই ছিল মহিনা, তার হাত থেকে অন্য বন্দুকটা নেবার জন্যে পাশের দিকে হাত বাড়ালুম—কিন্তু বন্দুক পেলুম না। চমকে চেয়ে দেখি, মহিনা আমার পাশে নেই! কী সর্বনাশ!

সিংহের সেই ভয়াবহ মূর্তি দেখে মহিনা ও তার সঙ্গী পিঠটান দিয়েছে এবং এতক্ষণে তারা আমার বন্দুক ও তাদের পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে খুব চ্যাঙা একটা গাছের টঙে গিয়ে উঠেছে!

আমার সামনে রুদ্রমূর্তি সিংহ এবং আমার হাতে একটা শূন্য বন্দুক অবস্থাটা খুব আরামের নয়।

সে-অবস্থায় কী আর করি,—আমিও মহিনার পথ অনুসরণ করে দৌড়ে গিয়ে একটা গাছের উপরে চড়বার চেষ্টা করতে লাগলুম।

কিন্তু আমার সে-চেষ্টা ব্যর্থ হত নিশ্চয়ই,—যদি-না আমার একটা গুলি লেগে তার পিছনের একখানা পা ভেঙে না যেত। কিন্তু সেই অবস্থাতেই, খোড়াতে খোঁড়াতে সে আর একটু হলেই আমাকে ধরে ফেলেছিল!

বদমাইশ মানুষখেকো সিংহটা যখন দেখলে আমিও তার নাগালের বাইরে এসে পড়েছি, তখন সে আবার খোড়াতে খোড়াতে ঝোপের দিকে ফিরে চলল।

কিন্তু ততক্ষণে মহিনা হাত বাড়িয়ে আমাকে আমার বন্দুকটা ফিরিয়ে দিয়েছে এবং আমিও কালবিলম্ব করলুম না, আর এক গুলিতে দুরাত্মাকে একেবারে মাটির উপরে পেড়ে ফেললুম।

সিংহটা আর নড়েও না, চড়েও না—আপদ একেবারে চুকে গেছে! বিপুল আনন্দে ও উৎসাহে আমি গাছের আশ্রয় ছেড়ে আবার মাটির উপরে অবতীর্ণ হলুম। কিন্তু কী ভয়ানক ব্যাপার, সিংহটা তো মরেনি, আমাকে দেখেই এক লাফে সে উঠে দাঁড়াল, এবং জ্বলন্ত চক্ষে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

কিন্তু এবারে আমার হাতে ছিল ভরতি বন্দুক—একটা গুলি তার বুকে ও আর একটা তার মাথায় ছুড়তেই সিংহটা হল পপাত ধরণীতলে! কিন্তু তখনও সে কাবু হয়ে পড়ল না, বিষম বিক্রমে মাটির উপর থেকে একটা গাছের ডাল তুলে নিয়ে কামড়াতে কামড়াতে সে প্রাণত্যাগ করল—সত্যসত্যই বীরের মতো!

ক্রমাগত বন্দুকের আওয়াজ শুনে ছাউনির কুলিরা ততক্ষণে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে! তাদের শেষশত্রুর পতন দেখে তারা যেন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল!

সিংহের উপরে তাদের এমন আক্রোশ যে, আমি যদি বাধা না দিতুম, তাহলে মৃত পশুরাজের দেহটা তারা নিশ্চয়ই তখনই টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলত!

মাপজোক নিয়ে দেখা গেল, দ্বিতীয় সিংহটা মাথায় তিন ফিট সাড়ে এগারো ইঞ্চি উঁচু এবং লম্বায় নয় ফিট ছয় ইঞ্চি। তার দেহের ভিতর থেকে পাওয়া গেল সাত-সাতটা গুলি! দ্বিতীয় নরখাদকের মৃত্যু-সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার আমার তাবুর কাছে দেশ-বিদেশের লোক এসে

জমায়েত হল—শয়তানের দেহ এবং শয়তানকে যে বধ করেছে তাকে দেখবার জন্যে সকলের আগ্রহের আর সীমাপরিসীমা নেই!

সবচেয়ে আনন্দিত হলুম আমি,—যখন পলাতক কুলিরা আবার ফিরে এসে কাজে যোগ দিলে। একটি সুন্দর রৌপ্যপাত্রে তাদের কাছ থেকে আমি যে অভিনন্দন-লিপি পেলুম, তা হচ্ছে এই:

মহাশয়,

আমরা—আপনার কর্মচারীরা,—এই রৌপ্যপাত্রটি স্মৃতিচিহ্ন-রূপে আপনাকে উপহার দান করছি। কারণ আপনার সাহসের জন্যেই আমরা দুটো মানুষখেকো সিংহের কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছি। আপনার নিজের প্রাণকে বিপদগ্রস্ত করেও আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন। আপনি দীর্ঘজীবন, সুখ ও শান্তি লাভ করুন।

আপনার অনুগত ও কৃতজ্ঞ ভৃত্য
(বাবু) পুরুষোত্তম হুরজি পুরমার
(রেলপথের ওভারসিয়ার)
তারিখ—সাভো, ৩০ জানুয়ারি, ১৮৯৯

এই রৌপ্যপাত্রটি আমি আমার গৌরবজনক ও বহুশ্রমলব্ধ উপহার বলে সযত্নে রক্ষা করছি।

# আট

রেল-রাস্তা তখন আঠি নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছেছে।

আমার বন্ধু ডাক্তার ব্রক হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে কাল শিকার করতে যাব। আর, আমাকে একটা সিংহ খুঁজে দিতে হবে।

আমি বললুম, তথাস্তু।

পরদিন সকালে উঠেই আমরা খাবার, পানীয়, বন্দুক ও লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

ছাউনিতে রোশন খাঁ নামে আমার এক চাকর ছিল, সে হঠাৎ বায়না ধরে বসল, তার শিকার দেখবার শখ হয়েছে, সে-ও আমাদের সঙ্গে যাবে।

রোশন খাঁ জাতে পাঠান, বয়সে যুবক, দেখতে সুন্দর, কাজে খুব চটপটে, আর তার স্বভাবটিও সৎ।

মনে মনে ভাবলুম, রোশন খাঁ যখন শিকারে গেলে আমাদের লাভও নেই লোকসানও নেই, তখন তার সাধ আর অপূর্ণ রাখি কেন? চলুক সে আমাদের সঙ্গে!

কিন্তু তখন ভাবতে পারিনি যে, রোশন খাঁ আমাদের সঙ্গে না গেলে এ যাত্রা শিকার থেকে আমাকে আর ফিরে আসতে হত না! দুনিয়ায় কিছুই তুচ্ছ নয়!

মাইল কয়েক এগিয়েও শিকার করবার মতো কিছুই পাওয়া গেল না। তবু আমাদের উৎসাহের অবধি নেই! কারণ এ হচ্ছে এমন ঠাই যে, ঝোপঝাপের ভিতর থেকে যে-কোনও মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড সিংহ ঝাঁকড়া চুলে ঝাঁকনি দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারে! সাক্ষাৎ মৃত্যু লুকিয়ে আছে এখানে যেখানে-সেখানেই। একটু অসাবধান হয়েছ কী, যমের বাড়ির ফটক খুলে গেছে তোমার সামনে!

জঙ্গলের ভিতরে দূর থেকেই দেখা গেল, খানিকটা খোলা সবুজ জমি। সেইখানে ষাড়ের মতন বড়ো কৃষ্ণসার জাতীয় একদল হরিণ চরে বেড়াচ্ছে।

আমি শিস দিয়ে সেইদিকে ডাক্তার ব্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম।

ব্রক তখনই পরম উৎসাহে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন, আমি সেইখানে বসে বসে দেখতে লাগলুম, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

ডাক্তার ব্রকের মূর্তি যখন বনপথের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, রোশন খাঁ তখন পিছন থেকে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, সায়েব দ্যাখো, বুনো-আদমিরা আসছে।

আমি কিন্তু তা শুনে উত্তেজিত হলুম না, কারণ ভারতবাসীরা আফ্রিকার লোকদের বুনো-আদমি বলেই ডাকে।

পাঁচজন সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ মাসাই-জাতীয় পুরুষ আমার সামনে এসে দাঁড়াল—তাদের প্রত্যেকেরই হাতে লম্বা এক-একটা বর্শা।

একজন আমাকে শুধোলে, হুজুরের কী ইচ্ছা?

আমি বললুম, সিংহ।

সে বললে, আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাকে অনেক সিংহ দেখাব।

তখনই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, কতদূরে আমাকে যেতে হবে?

—খুব কাছেই।

চারিদিকে চেয়ে ব্রকের খোঁজ করলুম, কিন্তু তার টিকিট পর্যন্ত দেখা গেল না। কিন্তু পাছে এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়, সেই ভয়ে ব্রককে ফেলেই আমি মাসাইদের সঙ্গে অগ্রসর হলুম।

দু-মইল পথ হাঁটবার পর মনে হল, সিংহ তো খুব কাছেই নেই। আমি অধীর ভাবে মাসাইদের দিকে ফিরে বললুম, এই কি তোমাদের খুব কাছে? কোথায় তোমাদের অনেক সিংহ ?

কিন্তু জবাব পেলুম না। আরও খানিকটা এগিয়ে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম, কই, সিংহ কোথায় ?

একজন মাসই থিয়েটারি ঢঙে সুমুখের দিকে বর্শটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, দেখুন প্রভু, ওই দেখুন সিংহ!

তাই তো, একটা সিংহী দূরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তো বটে। একটা গাছের তলাতেও সন্দেহজনক কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে! ভালো করে দেখে মনে হল, না বিশেষ-কিছু নয়, বোধহয় গাছের গুড়িতে ডালপালা দুলছে।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটলুম—পাছে সিংহীটা আমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ে। আচম্বিতে আমার পাশের দিক থেকে কে হুঙ্কার দিয়ে উঠল! চমকে ফিরে দাঁড়ালুম। যে-গাছটা দেখে প্রথমেই আমার সন্দেহ জেগেছিল, তার গুড়ির পাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে কালোকেশর-ওয়ালা মস্ত এক সিংহ!

আমার আর তার মাঝখানকার ব্যবধান সত্তর গজের বেশি হবে না।

খানিকক্ষণ আমরা দুজনেই দুজনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলুম। সে একবার প্রকাণ্ড হা করে মুখ খিচিয়ে আমাকে রীতিমতো এক ধমক দিলে, তারপর সিংহীটার দিকে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ওই সিংহীটা হচ্ছে নিশ্চয়ই এর বউ! এ গাছের তলা দেখে দেখতে পেয়েছিল, অসভ্য এক মানুষ তার বউয়ের পিছু পিছু ছুটছে! সে পশুরাজ, মানুষের এত বড়ো আস্পর্ধা সহ্য করবে কেন? কাজেই খাপ্পা হয়ে ধমক দিয়ে বোধ হয় বলে উঠেছিল—খবরদার, বেয়াদপ! যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলুম, সেখান থেকে বন্দুক ছোড়ার সুবিধা ছিল না। কাছেই একটা ভালো জায়গা বেছে নেবার জন্যে আমিও তার উপরে চোখ রেখে দৌড়োতে শুরু করলুম। কিন্তু আরে, এ আবার কী?

পশুরাজ যে-গাছের পিছন থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এল, তারই পিছন থেকে আবার লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল আরও চার-চারটে সিংহী! পশুরাজের অন্তঃপুরে কত সিংহী আছে? মহা বিস্ময়ে আমি যেন থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম!

চোখের পলক পড়তে না পড়তে তিনটে সিংহী জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল, কিন্তু চতুর্থ সিংহীটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—আমাকে নয়—আমার দলের লোকজনদের উত্তেজিত ভাবভঙ্গি অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়? খুব টিপ করে আমি বন্দুক ছুড়লুম এবং পরমুহূর্তে সিংহীটা লাফ মেরে পাশের ঝোপের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

উঁচু হয়ে উকি দিয়ে দেখলুম, আমার গুলি ঠিক তার গায়ে লেগেছে, কারণ সে মাটিতে চিত হয়ে পড়ে ছটফট করছে এবং গজরাতে গজরাতে শূন্যে থাবা মারছে!

সে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না বুঝে আমার পিছনের লোকদের ডেকে বললুম, তোমরা এখানে পাহারা দাও!—বলেই আমি সেই কালো-কেশরওয়ালা সিংহের উদ্দেশ্যে ছুটলুম। সিংহটা বেশিদূরে যায়নি। সে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বোঝবার চেষ্টা করছিল, আমার আসল মতলবখানা কী? পরে আমার লোকজনদের মুখে শুনেছিলুম আমার গুলি খেয়ে সিংহীটা যখন আর্তনাদ করে ওঠে, তখন সে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে বোধহয় ভাবছিল যে, এগিয়ে এসে সিংহীকে উদ্ধার করবে কি না! তারপরে বোধ করি 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' এই ভেবে আবার সে দৌড়োতে শুরু করে।

সিংহটা যখন বুঝলে আমি এখন তারই পিছু নিয়েছি, তখন সে দৌড় বন্ধ করে আবার আর-একটা গাছের তলায় গিয়ে ঝোপের ভিতরে সর্বাঙ্গ ঢেকে দাঁড়াল—দেখা যেতে লাগল কেবল তার মাথাটা ।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুব সতর্ক দৃষ্টিতে সে আমার প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ ও মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ গর্জন করতে লাগল—যেন সে বলতে চায়,

দ্যাখো, ভালো হচ্ছে না কিন্তু! বার বার আমার পেছনে লাগলে মজাটা টের পাইয়ে দেব—হ্যাঁ!

তার চাউনিটা আমারও মোটেই ভালো লাগছিল না,—কাছে কোনও গাছ-টাছ থাকলে আমি নিশ্চয়ই আগে তার উপরে গিয়ে চড়তুম, তবে বন্দুক ছুড়তুম!

সে আমার কাছ থেকে তখন মোটে পঞ্চাশ গজ তফাতে আছে। যা থাকে কপালে—এই ভেবে আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লুম এবং তার মাথা টিপ করে বন্দুক তুললুম। আমি বেশ বুঝলুম যে, যদি প্রথম গুলি ঠিক জায়গায় না লাগে, তাহলে আর আমার বাঁচোয়া নেই,—বিদ্যুতের ঝড়ের মতো সে একেবারে আমার ঘাড়ের উপরে এসে পড়বে!

টিপলুম আমার বন্দুকের ঘোড়া! ধ্রুম করে আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই সেই মস্ত বড়ো ঝাঁকড়াচুলো কালো মাথাটা গেল অদৃশ্য হয়ে! এবং পরমুহূর্তে ঝোপের ভিতর থেকে ঘন ঘন এমন হুঙ্কার ও গর্জন উঠল যে, আমার বুক সন্ত্রস্ত হয়ে ধড়ফড় করতে লাগল! এবং পাছে সে সামলে উঠে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে আসে এই ভয়ে ঝোপের ভিতরে আন্দাজে আন্দাজেই আমি আধ-ডজন গুলি বৃষ্টি করলুম। খানিক পরেই সব চুপচাপ।

পশুরাজের লীলাখেলা নিশ্চয়ই সাঙ্গ হয়ে গেছে! একজন লোককে সেইখানে পাহারায় রেখে আমি আবার ঝোপঝাপ, পাথর ও ঢিপি প্রভৃতি টপকে সেই সর্বপ্রথম সিংহীর সন্ধানে ছুটলুম। আমার আশার যেন শেষ নেই।

এতক্ষণে আমার পিছনে লোক জড়ো হয়েছে প্রায় ত্রিশজন! আফ্রিকার জঙ্গলে সবই আজব কাণ্ড। তুমি শিকারে বেরুলে পর দেখবে, জনমানবহীন গভীর অরণ্যের যেখানসেখান থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে মানুষ আবির্ভূত হচ্ছে! এরা আছে মৃত শিকারের পশুর মাংসের লোভে ।

আমি ইশারায় তাদের বললুম, যে জঙ্গলের ভিতরে সর্বপ্রথম সিংহীটা আশ্রয় নিয়েছিল, সার বেঁধে সেইদিকে অগ্রসর হতে।

তারা সার বেঁধে বর্শা উঁচিয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে যেই জঙ্গলের কাছে গিয়ে হাজির হল, সিংহীটাও অমনি ভয় পেয়ে খোলা জমির উপরে বেরিয়ে এল।

আমি বন্দুক ছুড়লুম। গুলি সিংহীর গায়ে লাগল কি না জানি না, সে কিন্তু আবার ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কী আর করি, ব্রক ফিরে না আসা পর্যন্ত ওকে রেহাই দেওয়া যাক,—এই ভেবে আমি যে-সিংহটাকে গুলি করেছিলুম, আবার তারই খোজ করতে লাগলুম। কিন্তু যে-লোকটাকে সেখানে পাহারায় রেখে গিয়েছিলুম, একলা থাকতে ভয় পেয়ে সে কোথায় লম্বা দিয়েছে! বনের সব ঝোপই প্রায় একরকম দেখতে, কোন ঝোপে সিংহটা আছে তা কে জানে!

কিন্তু এত বড়ো শিকার হাতছাড়া করতে আমার মন সরল না। তাই সবাই মিলে আমরা প্রত্যেক ঝোপঝাপ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলুম।

অবশেষে একজন সানন্দে চিৎকার করে বললে, ওই যে, ওইখানে সিংহটা রয়েছে।— কিন্তু বলেই সে লম্বা লম্বা লাফ মেরে ঝোপের কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

ঝোপের কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি দেখলুম—সত্য, এমন সিংহ শিকার করতে পারা ভাগ্যের কথাই বটে!

কিন্তু তখনও সে মরেনি। সে সটান মাটির উপরে পড়ে আছে বটে, কিন্তু প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের দুই পাশ উঠছে ও নামছে! তার চারপাশ ঘিরে এতগুলো লোক উত্তেজিত ভাষায় গোলমাল করছে, তবু সে উঠে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে না দেখে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হল, তার অন্তিম মুহূর্তের আর দেরি নাই। কাজেই আমি তাকে আরও ভালো করে দেখবার জন্যে তার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

কিন্তু যেমন আমার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়া, সিংহটা অমনি তার সমস্ত মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলে গেল! ভয়ংকর হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক লম্ফে সে খাড়া হয়ে

উঠল—তাকে দেখলে কে বলবে যে, সে আহত?—দুই চক্ষে তার দপদপ করে জ্বলছে প্রচণ্ড ক্রোধের অগ্নি, তার হী করা মুখ যেন নরকের গহ্বর এবং বড়ো বড়ো নিষ্ঠুর দাঁতগুলো চক চক করছে ধারালো অস্ত্রের মতো! তেমন বিভীষণ মূর্তি আমি কখনও দেখিনি এবং আর কখনও দেখতেও চাই না! নিতান্ত নিবোধের মতোই আজ আমি সাক্ষাৎ যমের খপ্পরে এসে পড়েছি—তার আর আমার মাঝখানে তফাত আছে মাত্র তিন হাত!

সিংহের গাত্রোত্থানের সঙ্গে-সঙ্গেই, যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল তারা সবাই ঠিক এক সঙ্গেই ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো এদিকে-ওদিকে ঠিকরে পড়ল এবং বানরের মতো ক্ষিপ্র গতিতে এক-একটা গাছের উপরে উঠতে লাগল।

রোশন খাঁ ভাবাচ্যাকা খেয়ে তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, পিছনে হটে আসতে গিয়ে আমি একেবারে তারই উপরে গিয়ে পড়লুম। বন্দুক আমার হাতে তৈরি ছিল, দিলুম তার ঘোড়া টিপে। সিংহটা তখন আমার মাথার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে হুমড়ি খেয়ে বসেছিল, গুলির চোটে তৎক্ষণাৎ সে চিতপাত হয়ে পড়ল—কিন্তু তারপরেই সে এক লাফে আবার দাঁড়িয়ে উঠল এবং এমন বিদ্যুতের মতো আমার দিকে ধেয়ে এল যে আমি আর বন্দুক তোলবারও সময় পেলুম না—তবু সেই অবস্থাতেই আর একবার গুলিবৃষ্টি করলুম! সে আবার আছড়ে পড়ল—এবং তখনই আবার লাফিয়ে উঠে আমার উপরে এসে পড়ল! তখন চক্ষে আমার অন্ধকার—জীবনের শেষমুহূর্ত উপস্থিত!

কেউ আমাকে বাঁচাতে পারত না, কিন্তু তবু আমি বেঁচে গেলুম দৈবগতিকে! এতক্ষণে রোশন খাঁর হুঁশ হল—সে বুঝতে পারলে যে, মৃত্যু তার সামনে এসেছে। অকস্মাৎ প্রাণপণে চিৎকার ও আর্তনাদ করতে করতে সে তিরবেগে পালাতে লাগল!

রোশন খাঁর পলায়নই আমার প্রাণরক্ষার কারণ! সে পালাতে গিয়ে ক্রোধে-উন্মত্ত সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং পশুরাজ তখন আমাকে ছেড়ে রোশন -র পিছনেই ছুটে গেল!

রোশন খাঁ পালিয়ে আমার প্রাণ তো বাঁচালে, এখন তার প্রাণ বাঁচাতে হবে আমাকে। পলক ফেলবার আগেই ফিরে দাঁড়িয়ে আমি আবার বন্দুক ছুড়লুম—কিন্তু সর্বনাশ! গুলি সিংহের গায়ে লাগল না! আমি ক্ষিপ্র হাতে বন্দুকে আবার টোটা ভরলুম বটে, কিন্তু সিংহ তখন একেবারে হতভাগ্য রোশন খাঁর উপরে গিয়ে পড়েছে, আর তাকে বাধা দেওয়া অসম্ভব!

ঠিক এই সময়ে ছুটতে ছুটতে রোশন খাঁ আরড়চোখে ফিরে তাকিয়ে নিজের ভয়ানক অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারলে এবং সঙ্গে সঙ্গে দিলে ডান দিকে এক লাফ! সিংহও ফিরে দাঁড়িয়ে তাকে আবার আক্রমণ করতে গেল, এবং এই সময়টুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট হল! সিংহ তখন মুখ ব্যাদান করে রোশন খাঁকে ধরতে উদ্যত হয়েছে—এমন সময়ে আমার গুলির চোটে সে ডিগবাজি খেয়ে ধরাশায়ী হল। সে আবার উঠে দাঁড়াবার আগেই আমি বন্দুক ছুড়লুম—আর একবার বিপুল গর্জন করে সে স্তব্ধ হল। তার সব লীলাখেলা শেষ। তখন রোশন খাঁর দিকে ফিরে আমি যা দেখলুম, সে এক মজার দৃশ্য! হাসতে হাসতে আমার পেটে গেল খিল ধরে, আমি মাটির উপরে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলুম!

একটা কাঁটাগাছ জড়িয়ে রোশন খাঁ তখন তড়তড় করে উপরে উঠছে, সিংহটা জীবিত কি মৃত তা দেখবার সময় তার নেই, তার দৃষ্টি একেবারে কাটাগাছটার টঙের দিকে! কাঁটায় লেগে তার পাগড়ি গেছে উড়ে, তার বাহারি ফতুয়াটা কাটাগাছের আর একটা ডালে ঝুলে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে এবং তার লম্বা জামাটাও ছিড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে! সে তবু গাছের উপরে উঠছে আর উঠছে আর উঠছেই—সিংহের কাছ থেকে সে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চায়! আমি তাকে নীচে নেমে আসবার জন্যে বারবার ডাকাডাকি করতে লাগলুম, কিন্তু

তখন তাকে থামায় কার সাধ্য,—একেবারে মগডালে গিয়ে যখন দেখল আর উপরে ওঠবার উপায় নেই, তখন সে থামল! কিন্তু নীচে সিংহটা মরে পড়ে আছে দেখেও সে আর নামতে রাজি হল না! বেচারা ভারী ভয় পেয়েছে, আর পাবেই তো–এ যে তার পুনর্জন্ম! এইবারে চারিদিককার গাছ থেকে মনুষ্য-বৃষ্টি শুরু হল—এ যাত্রা অনেক কষ্টে তারাও পৈতৃক প্রাণরক্ষা করেছে। মরা পশুরাজকে ঘিরে সবাই মহা স্ফূর্তিতে তাণ্ডব নাচ শুরু করলে। তারপর অভিনয়ও আরম্ভ হল—একজন সাজলে সিংহ, আর একজন আমার অংশ নিলে! মানুষ-সিংহ গজরাতে গজরাতে লাফ-বাপ মারছে, আর একজন আমার মতো পিছু হটতে হটতে বন্দুকের অনুকরণে আঙুলে তুড়ি দিতে দিতে চ্যাচাতে লাগল, টা, টা, টা! তারপর আর একজন রোশন খাঁ হয়ে সেই কাটাগাছের দিকে পালাতে লাগল—তার পিছনে পিছনে নকল সিংহ! সেই দৃশ্য দেখে আর-সবাই অট্টহাস্য করে উঠল!

এমন সময়ে ব্রক এসে হাজির। প্রথমেই মৃত সিংহটাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, তোমার বরাত খুব ভালো দেখছি!

আমি তখন সব ঘটনা বর্ণনা করলুম।

তাঁবুতে ফেরবার পথে একটা বুড়ো গন্ডার ভারী গোল বাঁধালে!

আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি, সেখানকার জমি বেজায় উচু-নীচু। আমি যাচ্ছিলুম আগে আগে ।

একটা উঁচু ঢিপির উপরে উঠে সামনেই দেখি, বিতিকিচ্ছি চেহারা নিয়ে মূর্তিমান এক গন্ডার!

হতভাগা জানোয়ারটার মেজাজ এমনি রুক্ষ যে, আমাকে দেখেই সে তড়বড়িয়ে এল তেড়ে।

তাকে বধ করবার সাধ আমার ছিল না, তাই আমি তাড়াতাড়ি সরে পড়লুম। কিন্তু আমি সরে পড়লে কী হবে, পিছনেই আমার সঙ্গীদের দেখে গন্ডারটা তাদের দিকেই ছুটে গেল!

ব্রক খুব দৌড়তে পারতেন, গন্ডারকে দেখেই তিনি তাঁর সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে একটুও দেরি করলেন না। আমি তখন সেইখানেই বসে বসে ব্রক আর গন্ডারের দৌড় দেখতে লাগলুম। আমি বেশ জানতুম যে গন্ডারটা সহজে ব্রককে ছাড়বে না—কিন্তু দৌড়ের জন্যে বিখ্যাত ব্রক যে অনায়াসেই গন্ডারকে কলা দেখাতে পারবেন, এ-বিষয়েও আমার সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনা! একটা গাছ লক্ষ্য করে দৌড়োতে দৌড়োতে ব্রক একবার পিছনে ফিরে দেখে নিতে গেলেন, শত্রু কত দূরে আছে! আচম্বিতে একটা গর্তে তার পা ঢুকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আছাড় খেয়ে মাটির উপরে সটান লম্বা হয়ে পড়ে গেলেন ও তার হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ল!

আতঙ্কে নিশ্বাস বন্ধ করে আমি উঠে দাঁড়ালুম, -- গন্ডারটা এই বুঝি ব্রকের উপরে গিয়ে পড়ল!

কিন্তু একটা আস্ত ও ছুটন্ত মানুষকে এমন অকারণে হঠাৎ মাটির উপরে শুয়ে পড়তে দেখে গন্ডারটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হল। বোধহয় সে ঠাওরালে এ হচ্ছে তাকে মুশকিলে ফেলবার কোনও নতুন ফিকির। সে আর এগুলো না, চটপট ফিরে দাঁড়িয়ে বোঁ বোঁ করে ছুটে পালাল! ওদিকে ব্রকও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে অন্যদিকে ফিরে না তাকিয়ে সামনের গাছের দিকে দিলেন বন বন করে পা দুটোকে চালিয়ে! কী কৌতুক! হাসতে হাসতে আবার আমার পেটে খিল ধরে গেল!

যা হোক, সমস্ত বিপদ এড়িয়ে শেষটা আমরা তাবুতে ফিরে এলুম। বোধহয় রোশন খা ছাড়া আজ আমাদের সকলেরই মেজাজ খুব খুশি!

এর পরেও আমি মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতুম, হ্যাঁ রোশন খাঁ, আর-একবার তুমি শিকার দেখতে যাবে?

অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ও সজোরে ঘন ঘন মাথা নেড়ে সে সাফ জবাব দিত, কভি নেহি, কভি নেহি!

# নয়

এখানে সিংহের অত্যাচারের এমন একটি গল্প বলব,—যার নায়ক আমি নই!

পূর্ব আফ্রিকার কিমা নামে জায়গায় ছোট্ট একটি রেলস্টেশন আছে। সে-অঞ্চলের এক সিংহের মনে একদিন হঠাৎ রেলকর্মচারীদের মাংস খাবার জন্যে যারপরনাই লোভের সঞ্চার হল!

দু-দিন পরেই দেখা গেল, স্টেশনের ভিতরে সিংহ-মহাশয় যখন-তখন যাতায়াত শুরু করেছেন। তার ভাব দেখে এটাও বেশ বোঝা গেল যে, কুলি-মজুর থেকে স্টেশন-মাস্টার পর্যন্ত কারুর তোয়াক্কাই সে রাখতে রাজি নয় এবং যাকে বাগে পাবে তাকেই ফলার করে ফেলতেও সে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করবে না!

এক রাত্রে ফলারের লোভে সে স্টেশনঘরের ছাদের উপরে লাফিয়ে উঠল এবং দাঁত ও থাবা দিয়ে ছাদের করগেটের লোহার তক্তাগুলোকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

ব্যাপার দেখে টেলিগ্রাফবাবুর পিলে গেল চমকে। তিনি ভারতবাসী ছিলেন,—পেটের দায়ে চাকরি করতে সুদুর আফ্রিকায় গিয়েছেন—সিংহ-টিংহের কোনওই ধার ধারেন না! ছাদের উপরে সিংহের আস্ফালনে ভয় পেয়ে ট্রাফিক ম্যানেজারকে তাড়াতাড়ি তার করে ‘তার’ করে দিলেন-- ‘সিংহ স্টেশনের সঙ্গে লড়াই করছে (Lion fighting with station), শীঘ্র সাহায্য পাঠান! যদিও স্টেশনের সঙ্গে লড়াই করে সিংহ সে-রাত্রে বিজয়ী হতে পারলে না, কিন্তু তারপরেই দিন-কয়েকের মধ্যে একে একে সে অনেকগুলো লোককে পেটের ভিতরে অনায়াসে পূরে ফেললে!

কিমা স্টেশনের কর্মচারী ও কুলি-মজুরদের মধ্যে অনেকেই ছিল ভারতবাসী। সিংহের ভয়ে তারা কাজকর্ম প্রায় বন্ধ করে দিলে!

ব্যাপার গুরুতর দেখে সেখানকার পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট রিয়াল সাহেব, দুই বন্ধুর সঙ্গে সিংগিমামাকে একেবারে নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে দিতে এলেন।

স্টেশনে নেমেই তিনি শুনলেন, এইমাত্র সিংহ-মহাশয় স্টেশনের চারিদিকে সান্ধ্যভ্রমণ করে গেছেন।

সিংহটা কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে বুঝে রিয়াল সাহেব স্থির করলেন, আজ স্টেশন থেকে এক পা নড়বেন না! তিনি হুকুম দিলেন, তার কামরাটি যেন রেলগাড়ি থেকে আলাদা করে, লাইনের উপরে বন-জঙ্গলের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়!

সাহেবের হুকুমমতো কাজ করা হল। কিন্তু লাইন তখন মেরামত করা হচ্ছিল বলে কামরার গাড়িখানা ঠিক সমান ভাবে দাঁড় করানো গেল না।

রিয়াল সাহেবের দুই সঙ্গীর একজনের নাম মি. হুবনার, আর একজনের নাম মি. পেরেন্টি। তারা তিনজনে বন্দুক হাতে করে চারিদিকে একটা চক্র দিয়ে এলেন। কিন্তু সিংহের নাম-গন্ধও না দেখে ডিনার খাবার জন্যে আবার গাড়ির ভিতরে ফিরে এসে বসলেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল! তারপর তিনজনেই কামরার জানলার কাছে বসে পশুরাজের যথোচিত অভ্যর্থনার জন্যে রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

অন্ধকার রাত্রি, চারিদিকে জঙ্গল আর ঝোপঝাপ। কিন্তু সিংহের কোনও পাত্তাই নেই! কেবল এক জায়গায় দেখা গেল, দুটো অত্যন্ত-উজ্জ্বল জোনাকি সমানভাবে দপদপ করে জ্বলছে!

পরের ঘটনার প্রকাশ পেয়েছিল, সাহেবরা যা জোনাকি ভেবে অবহেলা করলেন, তা হচ্ছে স্বয়ং পশুরাজেরই দুটো জ্বলন্ত চোখ। কারণ বিড়ালের মতো বাঘ ও সিংহের চোখও অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকে!

সাহেবরা যখন সিংহের অপেক্ষায় বসে ছিলেন, সে নিজেই তখন অন্ধকারে থাবা পেতে বসে সাহেবদের সমস্ত গতিবিধি লক্ষ করছিল এবং বোধহয় মনে মনে মানুষের নিবুর্দ্ধিতা দেখে হাসছিল! এই ব্যাপারেই বোঝা যায়, মানুষ-শিকারে সিংহটা কতবড়ো পাকা।

সিংহের সাড়া না পেয়ে রিয়াল সাহেব তার বন্ধুদের বললেন, ওহে, সবাই মিলে রাত জেগে কী হবে? ততক্ষণ তোমরা ঘুমিয়ে নাও, আমিই এখানে পাহারায় বসে আছি!

কথাটা সঙ্গত বুঝে বন্ধুরাও বললেন, সেই ঠিক! কামরার ভিতরে শয্যাস্থান ছিল দুটি,—একটি টঙের উপরে আর একটি জানলার ধারে। উপরের বিছানায় শুলেন হুবনার। পেরেন্টি বললেন, রিয়াল, তুমি নীচের বিছানাটা দখল কোরো। আমি কামরার মেঝেতেই আজকের রাতটা বেশ কাটিয়ে দিতে পারব।—এই বলে তিনি মেঝের উপরেই বিছানা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। তার পা দুটো রইল কামরার ভিতরে আসা-যাওয়া করবার পাশে-ঠেলা দরজার দিকে।

রিয়াল একলাটি বসে বসে পাহারা দিলেন—অনেক রাত পর্যন্ত, কিন্তু কোথায় সিংহ ? শেষটা হতাশ ও বিরক্ত হয়ে তিনিও জানলার ধারের বিছানায় শুয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে লাগলেন। রেললাইন থেকে কামরার জানালা ছিল অনেক উচুতে, কাজেই তার মনে কোনওরকম বিপদের ভয়ও হল না।

যে-মুহূর্তে রিয়াল ঘুমিয়ে পড়লেন, বাইরের অন্ধকার থেকে সিংহটাও যে তখনই গাঝাড়া দিয়ে উঠেছিল, পরে তার প্রমাণের অভাব হয়নি। সে সোজা দুটো উঁচু সিঁড়ির ধাপ দিয়ে গাড়ির উপরে উঠল। পাশে ঠেলা দরজাটা খুব সম্ভব একটুখানি খোলা ছিল, সিংহটা থাবা দিয়ে দরজাটা সন্তপর্ণে সম্পূর্ণরূপে খুলে

ফেলে একেবারে কামরার ভিতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু আগেই বলেছি, লাইনের দোষে গাড়িখানা ঠিক সমানভাবে দাঁড় করানো ছিল না। সিংহের বিপুল দেহ কামরার ভিতরে ঢুকবামাত্র তার ভারে সমস্ত গাড়িখানা আর একদিকে কাত হয়ে পড়ল, ফলে পাশে-ঠেলা দরজাটা আবার আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। তখন একই কামরার ভিতরে বন্ধ হয়ে রইল বিশালাকার সেই সিংহটা এবং তিনজন ঘুমন্ত মানুষ! ভাবতেও কি তোমাদের গা শিউরে উঠছে না?

সিংহ কামরায় ঢুকে সর্বাগ্রে রিয়ালকেই লক্ষ করলে। সে বোধহয় অন্ধকারে বসে বসে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিল যে, রিয়ালই তার সবচেয়ে বড়ো শত্রু। কারণ তার পায়ের তলাতে মুখের কাছেই শুয়ে ছিলেন পেরেন্টি, সুতরাং সে খুব সহজেই তাকে আক্রমণ করতে পারত, কিন্তু তা না করে সে ঘুমন্ত পেরেন্টির উপরে পা তুলে দাঁড়িয়ে রিয়ালের উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

তীব্র এক আর্তনাদে উপরের বিছানায় হুবনারের ঘুম গেল ভেঙে। তড়াক করে উঠে বসে তিনি স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন, প্রকাণ্ড এক সিংহ পিছনের দুই পা রিয়ালের দেহের উপরে স্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছে!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে এমন দৃশ্য দেখলে হুবনারের মনের ভাব কী রকম হওয়া উচিত, তা বোধহয় তোমরা বুঝতেই পারছ? হুবনার আতঙ্কে একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেলেন! তিনি সভয়ে আরও দেখলেন, তারও পালাবার কোনও উপায়ই নেই! একমাত্র যে পথ আছে তা হচ্ছে দ্বিতীয় একটা পাশে ঠেলা দরজা— যা দিয়ে চাকরদের মহলে যাওয়া যায়। কিন্তু সে পথ তো সিংহের নাগালের মধ্যেই! সে পথে পালাতে গেলে এক থাবায় সে তো তার মাথাটাই উড়িয়ে দেবে!

পেরেন্টির অবস্থা আরও শোচনীয়। ঘুম ভেঙেই তিনি দেখলেন তার বুকের উপরে কয়েক মন ওজনের এক ভীষণ সিংহ, তার আর নড়বার চড়বার উপায় পর্যন্ত নেই! চোখ কপালে তুলে তিনি আড়ষ্ট হয়ে রইলেন।

রিয়াল তখন সিংহের কবলে ইঁদুরের মতন ছটফট ও বিষম যাতনায় পরিত্রাহি চিৎকার করছেন!

হুবনার দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে উপর থেকে পালাবার জন্যে লাফ মারলেন। কিন্তু পড়লেন গিয়ে একেবারে সিংহের পিঠের উপরে। তা ভিন্ন আর উপায়ও ছিল না, কারণ তার বিপুল দেহ সমস্ত পালাবার পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভয়ে পাগলের মতন না হলে হুবনার কখনই এমন বোকার মতন সাক্ষাৎ-মৃত্যুর কবলে ঝাঁপ দিতে পারতেন না!

সৌভাগ্যক্রমে সিংহটা তখন রিয়ালকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তার পিঠের উপরে যে একটা তুচ্ছ মানুষ লাফিয়ে পড়ল এটা সে খেয়ালের মধ্যেই আনলে না!

হুবনার সিংহের পিঠ থেকে নেমে ওদিককার পাশে ঠেলা দরজার কাছে নিরাপদে গিয়ে পৌছলেন বটে, কিন্তু হতাশ ভাবে দেখলেন যে, স্টেশনের ভয়বিহ্বল ভারতীয় কুলির বাহির থেকে দরজাটা প্রাণপণে চেপে আছে—পাছে সিংহটা কোনও গতিকে বেরিয়ে পড়ে তাদের ঘাড় ভাঙতে চায়! কিন্তু হুবনার দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে দরজাটা কোনওরকমে একটুখানি খুলে সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কুলির দরজা তৎক্ষণাৎ আবার বন্ধ করে পাগড়ির কাপড় দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেললে!

পরমুহূর্তে ভয়ানক একটা শব্দ হল এবং গাড়িখানা আবার আর একদিকে হেলে পড়ল! সবাই বুঝলে, হতভাগ্য রিয়ালকে মুখে করে সিংহ জানলা গলে বাইরে বেরিয়ে গেল!

পেরেন্টি তখন টপ করে উঠেই অন্য পাশের জানালা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়লেন এবং এক দৌড়ে স্টেশনের ভিতর গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন! মরণের মুখ থেকে যে-ভাবে এ-যাত্রা তিনি পার পেয়ে গেলেন, বাস্তবিকই তা অসম্ভবের মতই আশ্চর্য!

পরদিন সকালে দেখা গেল, গাড়ির ভিতরটা, ও যে জানলা দিয়ে সিংহ বেরিয়ে গেছে, তার চারপাশের কাঠের তক্তা ভেঙে-চুরে তছনচ হয়ে আছে এবং সমস্ত কামরাটা রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে খানিক তফাতেই, জঙ্গলের ভিতরে অভাগা রিয়ালের দেহের খানিক অংশ পাওয়া গেল।

কিন্তু এই দুর্দান্ত পশুরাজকেও বনের ভিতরে আর বেশি দিন রাজত্ব করতে হয়নি। কারণ এ ঘটনার অল্পদিন পরেই রেল কর্মচারীরা ফাঁদ পেতে তাকে বন্দি করে। দিন কয়েক খাঁচার ভিতরে পুরে তাকে জীবন্ত অবস্থায় সকলের সামনে রেখে দেখানো হয়। তারপর তার পশুলীলা সাঙ্গ হয় বন্দুকের গুলিতে।

# দশ

এক রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি শুনছিলুম, গভীর অরণ্যের ভিতরে সিংহরা কীরকম গর্জনের পর গর্জন করছে! যেন তারা নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা কইছে! যেই একটা সিংহ গর্জন করে, অমনি আর একটা যেন উত্তর দেয়!

বুঝলুম, আপাতত যেখানে তাঁবু গেড়েছি, সে-জায়গাটা হচ্ছে সিংহদের মস্ত বড়ো এক আস্তানা !

চিড়িয়াখানায় লোহার খাঁচার বাইরে নির্ভাবনায় দাঁড়িয়ে সিংহের গর্জন শোনা এককথা, আর জঙ্গলের ভিতরে নড়বোড়ে, পাতলা তাবুর ভিতরে শুয়ে নিশুত রাতে আশপাশ থেকে অনেকগুলো সিংহের গর্জন শোনা আর এক ব্যাপার! তাবু তো ভারী জিনিস! সিংহের এক থাবার চোটে তা ছিঁড়েখুঁড়ে হুড়মুড় করে পড়ে যেতে পারে।

সিংহদের চিৎকার শুনে মনের যে-অবস্থাই হোক, এটা বেশ আন্দাজ করলুম যে, কালকের শিকারটা আমাদের জমবে ভালো!...হ্যা, পরদিনের শিকারটা খুবই জমেছিল বটে। জীবনে সেদিনের কথা ভুলতে পারব না,— ব্যাপারটা এমনি ভয়ানক!

যথাসময়ে শিকারে যাত্রা করা গেল। এবারে আমার সঙ্গী হলেন বন্ধু স্পুনার এবং তার সঙ্গে চলল, তার ভারতীয় ভৃত্য ইমামদীন ও আর একজন ভারতীয় শিকারি, নাম ভূতা। এবারের শিকারের নূতনত্ব হচ্ছে, আমরা ঘোড়ায় টানা টোঙ্গা গাড়িতে চড়ে চলেছি সিংহ শিকারে। আঠি নদীর ধারের ধুধু প্রান্তর প্রায় সমতল, সেখানে গাড়িতে চড়ে যাওয়া যখন যায়, তখন এমন সুযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পথে যেতে যেতে আমরা গোটকয়েক হরিণ শিকার করলুম। সবুজ ঘাসজমির উপরে চরতে চরতে তারা নিশ্চিন্ত প্রাণে নিজেদের খোরাক জোগাড় করছিল, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় এখন আমাদের খোরাকে পরিণত হল!

আঠি নদীর এই ময়দানময় খুব লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল আছে। সিংহরা লুকিয়ে থাকে তারই ভিতরে।

কিছুদূর এগিয়েই দেখা গেল, অল্প তফাতেই ঘাসজঙ্গলের মধ্যে একটা সিংহের দুটাে কানের ডগা বেরিয়ে আছে! ভালো করে দেখে বুঝলুম, সেটা সিংহী।

পরমুহুর্তেই তার পাশ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল, সুন্দর কেশরওয়ালা বলিষ্ঠ এক সিংহ! তারা একদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধহয় আমাদের উদ্দেশ্য বোঝবার চেষ্টা করছিল।

আমাদের গাড়ি তাদের দিকে অগ্রসর হতেই তারা ধীরকদমে চলে যেতে এবং যেতে যেতে সিংহটা বারংবার থেমে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল—যেন বলতে চায়, কে বাপু তোমরা? আমরা দুজনে এখানে খেলা করছি, হঠাৎ তোমরা আমাদের পিছু-পিছু আসছ কেন ?

আমাদের গাড়ি যত এগোয়, তারা তত দূরে চলে যায়। আমরা যে লক্ষ্মীছেলের মতো তাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসিনি, এটা তারা বুঝতে পেরেছিল।

তারা পাছে হাতছাড়া হয়, এই ভয়ে আমি দূর থেকেই বন্দুক ছুড়লুম। সিংহীটা গুলি খেয়েই মাটিতে চিতপাত হয়ে পড়ে শূন্যে চার পা ছুড়তে লাগল। আমি ভাবলুম, এখনই তার দফা রফা হয়ে যাবে,—কিন্তু না, মিনিট কয় পরেই সামলে উঠে সিংহীটা পাশের ঘাস জঙ্গলে ঢুকে পড়ল, সিংহটা তার আগেই সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে নিজের সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল।

তখন দিনের আলো ধীরে ধীরে কমে আসছিল এবং সাধ করে গরম গুলি খাবার জন্যে সিংহরা যে তাড়াতাড়ি জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে রাজি হবে, এমন কোনও সম্ভাবনা দেখলুম না। কাজেই হতাশ হয়ে সেদিনকার মতো তাদের রেহাই দিয়ে আমরা আবার তাঁবুর দিকে গাড়ির মুখ ফেরালুম। বলতে ভুলেছি যে, আমরা সঙ্গে একটি ঘোড়াও এনেছিলুম এবং টোঙ্গার আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে আসছিলুম আমি।

হঠাৎ আমার ঘোড়া আঁতকে উঠল! চেয়ে দেখি, তার পায়ের তলা থেকে একটা হায়েনা ঠিক যেন মাটি ফুড়ে উঠেই চম্পট দিলে! তারপরেই দেখি, আমার ঘোড়ার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাপছে! ব্যাপার কী?

এদিকে-ওদিকে তাকিয়েই দেখা গেল, বৃহৎ একজোড়া সিংহ প্রায় একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের পথ আগলে আছে!

তারা আস্তে আস্তে হাত-কুড়ি এগিয়ে এসে, মাটির উপরে থাবা পেতে কায়েমি হয়ে বসে স্থির-দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন বলতে চাইলে— এখানে এসেছ চালাকি করতে? যেতে আমি দিব না তোমারে!

আচ্ছা মুশকিল তো! আমি চেঁচিয়ে স্পুনারকে ডাকলুম। তিনি টোঙ্গা চালিয়ে পাশে এসে হাজির হলেন।

স্থির করলুম, পথ আগলানোর কত মজা, পশুরাজদের সেটা ভালো করে টের পাইয়ে দিতে হবে। স্পনারকে বললুম, ডাইনের সিংহটা তোমার, বাঁয়েরটা আমার।

দুজনে বন্দুক-হাতে পদব্রজে সিংহদের দিকে এগিয়ে যেতেই তাদের সব সাহস গেল কর্পূরের মতন উবে! কারণ তারা উঠেই টেনে দৌড় মারলে। সঙ্গে সঙ্গে আমার অগ্নিমুখী বন্দুক গুলিবৃষ্টি করলে—একটা সিংহ মাটির উপরে পড়ে শূন্যে থাবা মারতে লাগল। তারপরেই সে উঠে আবার পালাতে শুরু করলে।

আমিও নাছোড়বান্দা। ঘোড়ায় চড়ে আমিও তাদের পিছনে ছুটলুম।

তারা যখন দেখলে, আমি তাদের সঙ্গ ছাড়তে রাজি নই, তখন তারা দুজনে একসঙ্গেই আমাকে আক্রমণ করলে এবং আহত সিংহটাই আসতে লাগল আগে আগে।

ইতিমধ্যে স্পুনার ও অন্যান্য সকলেও আমার কাছে এসে পড়লেন। যে-সিংহটা এখনও অক্ষত আছে, আগে আমি তাকেই লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়লুম—সেও শূন্যে এক সুদীর্ঘ লম্ফ ত্যাগ করে দুম করে সশব্দে পড়ল মাটির উপরে এসে আহত সিংহটা তখন আমাদের উপরে ঝাপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল, কিন্তু স্পুনারের অব্যর্থ গুলি তখনই ছুটে গিয়ে তার লাফ-ঝাপ এ-জন্মের মতো বন্ধ করে দিলে।

আমি যাকে গুলি করেছিলুম, এখনও সে মরেনি, মাটির উপরে চার পা ছড়িয়ে বসে ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমরা অতি সন্তপর্ণে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। কিন্তু আমরা যেদিক দিয়েই অগ্রসর হই, সে-ও অমনি সেই দিকে ফিরে বসে। তার ভাবভঙ্গি তখন এমন ভয়ংকর যে, এক গুলিতে তাকে সাবাড় করতে না পারলে আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা!

আমি ক্রোধোন্মত্ত পশুরাজের আরও কাছে এগিয়ে গেলুম—আমার পিছনে পিছনে স্পুনার, তারপরে শিকারি ভূতা ও ইমামদীন। পশুরাজ এখন আমাদের কাছ থেকে প্রায় আশি গজ দূরে। রাগের চোটে সে মাটির উপরে ল্যাজ আছড়ে রাশি রাশি ধুলো ওড়াচ্ছে। স্পনারকে আগে বন্দুক ছুড়তে বলে আমি হাঁটু গেড়ে বসে প্রস্তুত হয়ে রইলুম।

বেশিক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হল না। যেমনি স্পুনারের বন্দুক গর্জে উঠল, সিংহটাও অমনি একলাফে উঠে পড়ে মেল-ট্রেনের মতন বেগে আমার দিকে ছুটে এল। আমি বন্দুক ছুড়লুম, সে গুলি তার গায়ে লাগল না। আবার বন্দুক ছুড়লুম, সে গুলি তার গায়ে লাগল না। আবার বন্দুক ছুড়লুম, কিন্তু সিংহ

তা গ্রাহ্যও করলে না! বন্দুকে আর টোটা ভরবারও সময় নেই—চোখের সামনে দেখলুম, মৃত্যু-বিভীষিকা!

মরণের অপেক্ষায় স্থির হয়ে বসে রইলুম, সিংহটাও প্রায় আমার উপরে এসে পড়ল, পরমুহূর্তেই ডান দিকে বেঁকে আমাকে পেরিয়ে চলে গেল—স্পুনারের দিকে না, সে স্পুনারকেও ছেড়ে দিলে এবং একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভূতার উপরে। ভূতার পা ধরে সে একটানে তাকে ধরাশায়ী করলে। ভূতা ও সিংহ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে খানিকদূর গড়িয়ে চলে গেল। তারপরই সিংহটা ভূতার দেহের উপরে দাড়িয়ে তার গলা কামড়ে ধরতে গেল, কিন্তু সাহসী ভূতা সিংহকে বাঁধা দেবার জন্যে নিজের বা হাতখানা দিলে তার প্রকাণ্ড হাঁয়ের ভিতরে ঢুকিয়ে। অভাগা ভূতা! নিশ্চয়ই সে নড়ে উঠেছিল, সিংহ তাই আমাকে ছেড়ে আক্রমণ করলে তাকেই!

সমস্ত ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল দুই-এক মুহুর্তের মধ্যেই। কিন্তু এই সময়টুকুর ভিতরে নিজেকে আমি সামলে নিলুম। স্পুনারের চাকর ইমামদীন বন্দুক নিয়ে সারা দিনই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে ছায়ার মতো। দুর্দান্ত সিংহের আক্রমণেও সে একটুও ভয় পায়নি বা থতোমতো খায়নি। এই বিপদের সময় বন্দুকটা সে আমার হাতে গুজে দিলে। ভূতাকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি ঝড়ের মতো ছুটে গেলুম। ইতিমধ্যে আমার আগেই স্পুনার সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন। ভূতা মাটির উপরে সটান পড়ে ছটফট করছে এবং তার উপরে রয়েছে সিংহটা। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে স্পুনার তখন সিংহের বিপুল দেহটা ভূতার গায়ের উপর থেকে ধাক্কার পর ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। স্পুনারের বুকের পাটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম। ভাগ্যে সিংহটা তার ধাক্কা গ্রাহ্য করলে না। সে তখন অভাগা ভূতার হাতখানা এমন এক মনে চর্বণ করছিল যে অন্য কোনওদিকে ফিরে তাকাবার অবসর পেলে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি পড়ে গেলুম ঠিক তার সামনেই! অমনি সে হস্ত চর্বণ বন্ধ করলে। যদিও সে ভূতার হাতখানা ছেড়ে দিলে না, তবু সেই অবস্থাতেই বড়ো বড়ো ধারালো দাঁতগুলো বার করে মুখ খিঁচিয়ে আমার ঘাড়ের উপরে লাফ মারবার উপক্রম করলে। বুঝলুম এক পলক দেরি করলেই সর্বনাশ! টপ করে বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়েই দিলুম আমি ঘোড়া টিপে। কিন্তু, কী ভয়ানক! ঘোড়া টিপলুম, তবু বন্দুকে আওয়াজ হল না! আমার প্রাণ স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর রক্ষে নেই! বন্দুকে আবার নতুন টোটা পুরবার আগেই সিংহটা নিশ্চয় আমার উপরে ঝাপিয়ে পড়বে! দারুণ ক্রোধে সিংহের চোখ দুটো তখন আগুনের ভাটার মতন দপ দপ করে জ্বলে জ্বলে উঠছিল! তার চোখে চোখ রেখে পায়ে পায়ে দুপা পিছিয়ে এলুম। আচমকা আমার মনে পড়ে গেল বন্দুকটা ছোড়বার আগে তার চাবি তো আমি টিপে দিইনি। যাহাতক এই কথা মনে হওয়া, তাহাতক চাবিটা টিপে বন্দুক ছুড়তে আমার আর এক মুহুর্তও দেরি হল না। গুলি খেয়ে সিংহটা দড়াম করে আছড়ে পড়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

সিংহের মৃতদেহের তলা থেকে আমরা তখন ভূতার দেহ টেনে বার করে ফেললুম। তার হাতখানা কামড়ে ধরেই সিংহটা পটল তুলেছিল, কাজেই ভূতার সেই ছন্ন-বিচ্ছিন্ন হাতখানাকে বার করবার জন্যে সিংহের চোয়াল দুটাে টেনে ফাঁক করে ধরতে হল। ভূতার জ্ঞান তখন প্রায় ছিল না বললেই চলে। ছুটে গিয়ে টোঙ্গা থেকে ব্রান্ডি এনে ভূতাকে খানিকটা খাইয়ে দিলুম। তার বা হাত আর ডান পা-কে তখন হাত পা বলেই চেনা যাচ্ছিল না। সেদিকে তাকিয়ে গা আমার শিউরে উঠল। যা হোক, কোনওক্রমে ধরাধরি করে ভূতার দেহকে টোঙ্গায় তুলে নিয়ে আমরা বাসার দিকে ফিরলুম।

ভূতার চিকিৎসার কোনওই ক্রটি হল না। ভালো ডাক্তার ঔষধপত্র সবই পাওয়া গেল। প্রথম প্রথম আমাদের খুবই আশা ছিল যে ভূতা এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাবে। তার হাতের ক্ষত সেরে এল বটে, কিন্তু তার পায়ের অবস্থা ক্রমেই—

শোচনীয় হয়ে উঠল। তবু সেই অবস্থাতেই সাহসী ভূতা বার বার বলতে লাগল, হুজুর, সবুর করুন—আগে সেরে উঠি, তারপর আমি দেখে নেব! আফ্রিকার সমস্ত সিংহকেই আমি নিজের হাতে বধ করব?

কিন্তু হায়, হতভাগ্য ভূতার শিকারের দিন শেষ হয়ে গেছে! তার পায়ে এমন পচ ধরল যে, পা-খানাকে কেটে দেহ থেকে বাদ দিতে হল। পা-কাটার সমস্ত কষ্টই ভূতা মুখ বুজে সহ্য করলে! কেবল এক ভাবনাতেই সে মুষড়ে পড়ল। সে বললে, হুজুর এক পায়ে খোড়াতে খোড়াতে আমি স্বর্গে যাব কেমন করে?

ভাই যেমন ভাইকে সেবা করে, তেমনি ভাবেই আমরা ভূতার সেবা করলুম বটে কিন্তু তবু তাকে বাঁচাতে পারলুম না। পা কাটার দিন-কয়েক পরেই ভূতার মৃত্যু হল।

# এগারো

মেজর রবার্ট ফোর‍্যা ন হচ্ছেন একজন বিখ্যাত শিকারি। আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে ইনি যে কত সিংহ, বাঘ, হাতি, গন্ডার, হিপো ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু বধ করেছেন, তার আর সংখ্যা নেই। নীচের গল্পটি তারই নিজের মুখে শোনো।

তখন বুয়োর-যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। সৈনিকের কাজ নিয়ে আমি ভারতবর্ষে এসেছি। যে জেলায় আমি ছিলুম, তার চারিধারে গভীর বন-জঙ্গল আর সেখানে বাঘের উপদ্রবও বড়ো বেশি। একটা বাঘের বদমায়েশি আবার এত বেড়ে উঠেছিল যে তাকে আর শাস্তি না দিলে চলে না।

একদিন খবর পাওয়া গেল, কাছে এক জঙ্গলে বাঘটা একটা মোষকে বধ করে খানিকটা খেয়ে ফেলে রেখে দিয়ে গেছে। বাঘেদের স্বভাবই হচ্ছে, যেসব জানোয়ার তারা বধ করে, এক দিনেই তারা খেয়ে সাবাড় করে দেয় না। খানিকটা এক দিন খায়, তার পরের দিন এসে আরও খানিকটা খায়। কাজেই মোষটাকে খাওয়ার জন্যে বাঘটা যে আবার ফিরে আসবে, এটুকু বেশ জেনেই আমি ঘটনাস্থানে গিয়ে হাজির হলুম।

মস্ত একটা গাছের উঁচু ডালে মাচান বেঁধে, আমি তার উপরে গিয়ে উঠে বসলাম। তখনও সন্ধে হয়নি। আজকের রাত এই মাচানে বসে কাটাতে হবে।

চারিধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। আমার সামনে খানিকটা খোলা জমি আর জলাভূমি।

তারপরেই দুর্ভেদ্য বন জঙ্গলের প্রাচীর, তার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। চারিদিক স্তব্ধ। আমি একলা।

খানিকটা পরেই বুঝলুম, আমি আর একলা নই, একটা শেয়ালও মোষের গন্ধ পেয়েছে। সে লক্ষ্যহীন ভাবে মোষটার চারিধারে দূরে দূরে ঘোরাঘুরি করছে, কিন্তু মোষটার মৃতদেহের দিকে ভুলেও ফিরে তাকাচ্ছে না। চালাক শেয়ালটার

মনের ভাব বোঝা একটুও শক্ত নয়। মোষের মাংসে তার প্রাণ নিশ্চয়ই আনচান করছে, কিন্তু তার মনের কথা সে মনেই লুকিয়ে রাখতে চায়। কী জানি, যে বাঘের এই মোষ, গাছের কোনও ঝোপেঝাপে যদি সে লুকিয়ে থাকে, আর বুঝতে পারে যে তার মোষের উপরে আমার নজর আছে, তাহলে আর কি সে আমাকে ছেড়ে কথা বলবে?

তার সেই মজার রকম সকম দেখে আমার ভারী আমোদ লাগল।

হঠাৎ শিয়ালটা একবার ক্যা-হুয়া—ক্যা-হুয়া করে চেঁচিয়ে উঠল! তারপরেই সাঁৎ করে আবার সে জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। মাংস খাওয়ার এমন সুবিধা সে ছাড়ল কেন, অবাক হয়ে তাই ভাবছি, এমন সময়ে দেখি না, সে পালায়নি। সে নিশ্চয়ই জঙ্গলের ভিতর গিয়ে দেখে এল, বাঘটা কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে কি না? খানিকক্ষণ খুব সতর্কভাবে কান খাড়া করে সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পায়ে পায়ে মোষের কাছে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ আবার পিছন দিকে এক লাফ মেরে পিছিয়ে এল। খুব ভয়ে ভয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল—দরকার হলেই যেন সে পালাবার জন্যে প্রস্তুত! কিছুক্ষণ ধরে এই একই বিচিত্র অভিনয় চলল—পায়ে পায়ে মোষের দেহের দিকে সে এগিয়ে যায়, হঠাৎ লাফ মেরে পিছিয়ে আসে এবং পালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে!

অবশেষে শিয়ালটা গলাটা খুব লম্বা করে বাড়িয়ে নাক দিয়ে মোষের দেহ স্পর্শ করলে তাতেও কোনও বিপদ হল না দেখে মোষের পেটের উপর দিলে সে বসিয়ে এক কামড়। উঃ, সঙ্গে সঙ্গে সে যে কী বিশ্রী দুর্গন্ধ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, কেউ তা ধারণায়ও আনতে পারবে না। অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি রুমাল বার করে আমি নাকের উপর চেপে ধরলুম। সেই সময় মাচানটা একটু মচমচ করে নড়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে আমাকে একবার দেখেই শেয়ালটা একেবারে দে ছুট তো দে ছুট!

প্রহসন শেষ হয়ে গেল। বনের বড়ো বড়ো গাছপালার পিছনে আকাশে সূর্য তখন মুখ রাঙা করে নেমে যাচ্ছে। লতাগুল্মের আড়াল থেকে একটি চমৎকার সারস পাখি লম্বা পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল। বাকে বাকে রংবেরঙের আরও নানান পাখি এসে বড়ো বড়ো গাছের ডালপালার ভিতরে আশ্রয় নিতে লাগল। দিন ফুরুল, সন্ধে হল,--শান্ত জীবদের ঘুমোবার সময় এল, এখন জেগে উঠবে খালি—দুর্দান্ত হিংস্র জন্তুরা।

এই সব গভীর অরণ্যে দয়া বলে কোনও জিনিস নেই। এক জীবের সঙ্গে অন্য জীবের দেখা হলেই আর কোনও কথা নেই—যুদ্ধ, যুদ্ধ, কেবল যুদ্ধ! জোর যার মুলুক তার হয় মরো, নয় মারো।

এই সব ভাবছি, আচম্বিতে কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনলুম। চেয়ে দেখি, ওদিককার একটা ঝোপ দুলে দুলে উঠছে। মড়মড় করে শুকনো পাতার শব্দ–যেন একটা মস্ত ভারী জন্তু বনের ভিতর দিয়ে আসছে। তারপরই বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা মাদি মোষ। তার শিং দুটাে কী লম্বা আর মোটা, মোষের এত বড়ো শিং আমি আর দেখিনি। আমার অত্যন্ত লোভ হল, বন্দুকটা একবার তুললুম, কিন্তু তার পরেই মনে পড়ল, এখানে আমি এসেছি বাঘ শিকারে, কোনওরকম উৎপাত হলে আজ আর বাঘের দেখা পাব না। বন্দুকটা আবার নামিয়ে রাখলুম!

খুব দূরের জঙ্গল থেকে আর একটা মোষের ডাক শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে মোষটাও শূন্যে মুখ তুলে চিৎকার করে সাড়া দিলে। বোঝা গেল মদ মোষটা তার বউকে কাছে আসবার জন্যে ডাকাডাকি করছে।

মাদি মোষটা আস্তে আস্তে এগিয়ে মরা মোষের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মৃতদেহটা বার কয়েক শুকে দেখলে। তারপর শূন্যে মুখ তুলে আবার একবার ক্রুদ্ধ-গর্জন করলে। বোধহয় সে আন্দাজ করতে পারলে, বিপদ বেশি দূরে নেই।

হঠাৎ সে কেমন যেন আঁতকে উঠল। তারপরই টপ করে ঘুরে দাঁড়াল—মাথা নামিয়ে জঙ্গলের একদিকে তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে।

তার দেখা দেখি আমিও সেই দিকে ফিরে তাকালুম। সত্য-সত্যই বাঘের আবির্ভাব হয়েছে। একমনে সে এগিয়ে আসছে, আর তার সাদা পেট লেগে লম্বা লম্বা ঘাসগুলো দুমড়ে পড়ছে।

তারপর মোষের সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সে থমকে দাড়িয়ে পড়ল। তার দেহ মূর্তির মতো স্থির, কেবল তার লেজটা ঝটপট করে মাটির উপর আছড়ে পড়ছে। মোষটা তার সামনের পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল—কিন্তু তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রইল বাঘের উপরে। মোষ আর বাঘ দুজনেই এখন প্রস্তুত। দুজনারই চোখ দুজনের দিকে তাকিয়ে— তাদের সমস্ত দেহের উপরেই যেন পরস্পরের প্রতি দারুণ ঘৃণার ভাব সেখানে রয়েছে। আমি বাঘকে আর গুলি করব না, জঙ্গলের এই অদ্ভুত অভিনয়ের পরিণাম কি দাঁড়ায়, আজ আমি সেইটাই ভালো করে দেখতে চাই।

ধীরে ধীরে ঘাসের উপরে লেজ আছড়াতে আছড়াতে বাঘটা মোষের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, তার দুই চোখ দিয়ে তখন যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

মোষটা এগিয়েও এল না, পিছিয়েও গেল না, কেবল বাঘটা যেদিকে যাচ্ছে সেইদিকে মুখ করে সে ফিরে ফিরে দাঁড়াতে লাগল। সে একটুও ভয় পায়নি, বরং তাকে দেখলেই ভয় হয়।

বাঘ মোষের চারিদিকে চক্রকারে ঘুরতে লাগল। চক্র ক্রমে ছোটো হয়ে আসছে। বাঘ কেবল সুযোগ খুঁজছে, একবার মোষের পিছন দিকে যেতে পারলেই এক লাফে সে তার ঘাড়ের উপর এসে পড়বে। মোষ কিন্তু বাঘের চেয়ে বোকা নয়। বাঘের মতলব সে জানে। জঙ্গলে তার বাসা, এখানকার লড়ায়ের কোনও কায়দাই শিখতে তার বাকি নেই।

হঠাৎ বাঘটা ধনুকের মতো কুঁকড়ে বেঁকে পড়ল এবং পরমুহুর্তেই তার দেহটা রকেটের মতো বেগে শূন্যের দিকে উঠে গেল। এবং সেই সঙ্গেই মোষটাও গর্জন করে শিং নামিয়ে বাঘকে আক্রমণ করলে।

বাঘের দেহের সঙ্গে মোষের শিং-এর মিলন হল শূন্য পথেই তারপরেই দুজনেই মাটির উপর পড়ে গেল এবং চোখের পলক পড়তে না পড়তেই দুজনেই আবার দাঁড়িয়ে উঠল। তারপরে দুজনে আবার দুজনকে আক্রমণ করলে এবং বাঘটা এসে পড়ল মোষের পিঠের উপর।

কিন্তু বাঘের দাঁত আর নখ তার পিঠের মাংসে বসবার আগেই মোষটা এক লাফ মেরে চিত হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়ল—নিজের দেহের বিপুল ভারে বাঘের দেহকে পিষে ফেলবার জন্যে। মোষের যুদ্ধের প্যাঁচ দেখে আমি তো অবাক!

মোষের দেহের চাপে চেপটে মরবার ইচ্ছা বাঘের মোটেই ছিল না। সে টপ করে মাটিতে নেমে পড়ল। মোষ আবার উঠে দাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আবার তার ডান কাঁধের উপর লাফিয়ে উঠল। মোষ এক ঝটকান মেরে বাঘকে আবার মাটিতে ফেলেই শিং দিয়ে তার দেহকে শূন্যে তুলে নিয়ে একটা ঝাউগাছের গুড়ির উপরে তাকে চেপে ধরলে। মোষের পিঠ ও কাঁধের উপরে বড়ো বড়ো ক্ষত দিয়ে রক্তস্রোত বেরুচ্ছে এবং তার মুখ দিয়েও ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। সে তাড়াতাড়ি কয়েক পা পিছিয়ে এল, তেড়ে গিয়ে বাঘকে আর একবার গুতিয়ে দেওয়ার জন্যে।

বাঘ তখনও কাবু হয়নি—যদিও তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে থেতলে গিয়েছিল। আবার সে লাফ মারলে এবং এবারে মোষের বড়ো বড়ো দুটো শিং-এর ঠিক মাঝখানে এসে পড়ল। বাঘের দেহের আড়ালে মোষের মুখ তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং বাঘের ধারাল নখে ও তীক্ষ্ণ দাঁতে মোষের দেহ তখন ছিন্ন ভিন্ন ও রক্তময় হয়ে উঠেছে! দারুণ যাতনায় মোষটা তখন আর্তনাদ করে উঠল।

তারপরে সেই অবস্থাতেই বাঘের দেহ নিয়ে সে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুড়ির উপরে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল। ধপাস করে ভীষণ একটা শব্দ হল,—বাঘের ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা গেল! টাল সামলাতে না পেরে মোষটা প্রথমে মাটির উপর বসে পড়ল, কিন্তু তার পরেই আবার চার পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বাঘের দেহ তার পিঠের উপর থেকে গড়িয়ে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল।

মোষ তাড়াতাড়ি আবার পিছিয়ে এল—তারপর তার নিষ্ঠুর শিং দুটোকে নামিয়ে চমৎকার ভাবে লক্ষ স্থির করে বেগে বাঘের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে ক্রমাগত গুতিয়ে দিতে লাগল। বাঘ তখন একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে এবং তার লড়ায়ের সাধও একেবারে মিটে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে বার বার সে জঙ্গলের ভিতরে পিঠটান দেওয়ার চেষ্টা করলে—কিন্তু জঙ্গলের যুদ্ধের আইনে ক্ষমা বলে কোনও কথাই নেই—হয় মরো, নয় মারো!

মোষ আবার তেড়ে এল, তারপর মাথা নামিয়ে বাঘের অবশ দেহটাকে আবার দুই শিংএ করে তুলে নিয়ে বেগে মাথা ঘুরিয়ে ঠিক যেন একটা খড়কুটা‌ের মতো অনায়াসে সেটাকে অনেকটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে!

মাটির উপরে পড়ে বাঘ আর নড়ল না। মোষ আর তার দিকে এগুলও না, ফিরে তাকালেও না। সে জানে এর পরে তার শত্রু আর বাঁচতে পারে না।

চমৎকৃত হয়ে মাচানের উপরে আমি বসে রইলুম। বাঘকে বধ করে মোষ যে আমার শিকার কেড়ে নিলে এজন্যে আমি কোনও দুঃখই অনুভব করলুম না! যে দৃশ্য আজ চোখের সামনে দেখলুম, শিকারের আনন্দ তার কাছে তুচ্ছ!

রাতের কালো পর্দা সারা বনের উপরে তখন নেমে এসেছে—যে হেরেছে আর যে জিতেছে, তাদের কারুকেই আর দেখা যায় না। ছোট্ট এক টুকরো চাঁদ আকাশের কপালে তিলকের মতো আঁকা রয়েছে, আঁধারের মুখ তাতে ঢাকা পড়ে না।

সেই নিবিড় অন্ধকারে মোষের বিজয়-গৌরব ভরা চিৎকার শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছের জঙ্গল থেকেই মন্দা মোষটা তার সঙ্গিনীকে সাড়া দিলে। তারপরই আবার জঙ্গল ভাঙার শব্দ, মাদি মোষটা বোধহয় তার সঙ্গীর কাছে মনের আনন্দে ছুটে চলে গেল।

বাঘের দেহটা আমি আর নিয়ে গেলুম না, ও দেহের উপরে আমার কোনও দাবি নেই।

# বারো

এ গল্পটিও মেজর রবার্ট ফোর‍্যান বলছেন —নানা দেশের নানা বনে আজ ত্রিশ বৎসর ধরে শিকার করছি। এতকালের এই অভিজ্ঞতার ফলে, আমি জোর করেই বলতে পারি, হাতি শিকারে যত বিপদ আর উত্তেজনা আছে, অন্য কোনও শিকারেই তা নেই।

দেহের যে-জায়গায় গুলি লাগলে হাতি সহজেই মারা পড়ে, হাতির খুব কাছে গিয়েও সেটা জানতে পারা সহজ নয়!

খানিক তফাত থেকে হাতিকে গুলি করলে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট। হাতির একটা বদ-অভ্যাস আছে, আহত হলেই, সে ফিরে দেখে নেয়, ঢ়িল ছুঁড়লে কে? সে-সময় শিকারির মনের অবস্থা যে-রকম হয়, তা আর বলবার নয়। একদল সিংহের মাঝখানে গিয়ে পড়লেও শিকারির মনের অবস্থা এমনধারা শোচনীয় হয় না। আহত হলেই হাতি ফিরে দাঁড়ায়, তার কুলোর মতো বড়ো বড়ো কান দুটো দু-দিকে ছড়িয়ে দেয়, যতটা উঁচু হতে পারে দেহটা ততখানি উচু করে তোমার দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ক্রোধে এমন ভীষণ গর্জন করে ওঠে, যে দেহের সমস্ত রক্ত যেন বরফের মতো জমাট হয়ে যায়।

আফ্রিকার হাতি তার স্বদেশে এক অতিকায় দানবের মতন। সামনে তাকে দেখলেই বুক যেন কুঁকড়ে আসে, আর নিজের হাতের বন্দুককে মনে হয়, তুচ্ছ একটা খড়কের মতো নগণ্য। যতই চেষ্টা করো, তার সামনে সিঁধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার! তখন পাগলের মতো তার সুমুখ থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে, তোমার মনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠবে। কতকাল ধরে শিকার করেছি, তবু আক্রমণোদ্যত হাতিকে দেখলেই আমার সমস্ত মন যেন ভয়ে এলিয়ে পড়ে।

কিন্তু এখন এসব কথা থাক। আজকে আমার শেষ শিকারের গল্প বলব। এই ঘটনার পরেও বার কয়েক আমি বনে-জঙ্গলে গিয়েছি—কিন্তু হাতে বন্দুক নিয়ে নয়, ক্যামেরা নিয়ে,—জীবজন্তুদের ফটাে তুলে নির্দোষ হিংসাহীন আনন্দ এবং উত্তেজনা লাভের জন্যে। হামিজি ছিল আমার বিশ্বাসী চাকর। আফ্রিকাতেই তার জন্ম, গায়ের রং তার কালো, কিন্তু তার মনটা ছিল যে-কোনও শ্বেতাঙ্গের চেয়ে সাদা।

হামিজি আর আমি সেদিন শিকারে বেরিয়েছিলুম। মস্ত একটা মদ মোষের পিছনে পিছনে বনের শুরু পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। হামিজি আমাকে অনুসরণ করছিল আমার বড়ো বন্দুকটা হাতে নিয়ে। বনপথে তখন কোনও বিপদের ভয় ছিল না। নির্জনতার শান্তিভঙ্গ করতে পারে, বনের ভিতরে এমন কোনও হিংস্র জন্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবারও সম্ভাবনা ছিল না। একটা গাছের ডালের উপরে দুটো পায়রা কেবল পরস্পরের সঙ্গে বাক্যযুদ্ধ করছিল। তাদের বকবকানি শুনতে শুনতে এগিয়ে গিয়ে পেলুম, আবার স্তব্ধ-শান্তির রাজ্য। রামধনুকের রং মাখা প্রজাপতিরা সবুজ শ্রী নাচঘরে পাখনা কাঁপিয়ে আনাগোনা করছিল।

সুন্দর একটি পাখি ডানা নাচিয়ে সামনে দিয়ে বিদ্যুতের মতো উড়ে গেল। তারপরই গাছের ঘন পাতার ফাক দিয়ে মুখ বাড়ালে এক জোড়া বাঁদর, তারপর মুখ ভেংচে আরও উঁচু ডালে তড়বড় করে গিয়ে উঠে পড়ল।

যে-বিজন বন দিয়ে চলেছি, বোধহয় সেখানে আর কোনও মানুষের পায়ের দাগ পড়েনি। এখানে একটু এদিক-ওদিক হলেই পথ হারাবার ভয়! সে বিপথে উপরে-নীচে কেবল সবুজ রঙের তরঙ্গ, ছায়ার-মায়ার চারিদিক অপূর্ব। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট অজানা সব ধ্বনি সেখানে কানের কাছে বেজে ওঠে। সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে ভয় পায়, অচেনা কীট-পতঙ্গ সব চারিদিকে আনাগোনা করে, অদেখা সব সাপ আর গিরগিটি এধারেওধারে ছুটে চলে যায়,

প্রেতলোকের কালো কালো পাখির ডানার ঝটপটানি শোনা যায়, এবং মনে হয় আমার আশেপাশে সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন অপেক্ষা করে আছে।

আমাদের ঘিরে আছে কী রহস্যময় নিস্তব্ধতা! এ নিস্তব্ধতাকে অনুভব করলে বুক যেন ভয়ে শিউরে ওঠে। অথচ এই নিস্তব্ধতার ধ্যান ভেঙে যাচ্ছে মাঝে মাঝে অজ্ঞাত দু-একটা পাখির ডাকে এবং মাঝে মাঝে, কে জানে কী বন্যজন্তু, শুকনো পাতায় আর্তনাদ জাগিয়ে, বিপুল সব গাছের তলা দিয়ে চলে যায়, কোথায় তা কেউ জানে না। বিজন বন বটে, কিন্তু প্রতিপদেই মনে হয়, কোনও সব বনবাসী জীবের দৃষ্টি তোমার দিকে স্থির হয়ে আছে। যতই চুপি চুপি আর সাবধানে তুমি এগিয়ে চলো, কিন্তু নিশ্চয় জেনো তোমার পায়ের শব্দ কারা শুনতে পাচ্ছে। তারা তোমার অপেক্ষায় ছিল না। কিন্তু তুমি যে এসেছ তারা তা টের পেয়েছে। তোমার সাড়ায় তারা হয় আক্রমণ নয় পলায়ন করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

আমরা দুজনে এগিয়ে যাচ্ছি, হামিজি আর আমি। কিন্তু আমরা কেউ ভাবতে পারিনি যে মৃত্যু আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। এর জন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না।

কারণ, হঠাৎ আমি মুখ তুলে দেখি, বিরাট এক হস্তী প্রকাণ্ড দুটো দন্ত নিয়ে আমার সামনেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চমকে আর থমকে তখনই দাঁড়িয়ে পড়লুম, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা তুললুম কাঁধের উপরে। পথের একটা বাঁকে হাতিটা পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল, আচম্বিতে আমাদের সাড়া পেয়েই ফিরে দাঁড়িয়েছে। সে কিছুমাত্র ইতস্তত করলে না, একেবারেই একটা চলন্ত-পাহাড়ের মতো আমাদের আক্রমণ করলে। বিকট চিৎকার করে শুড় তুলে সে ছুটে এগিয়ে আসছে। আমাদের দু-ধারে গভীর জঙ্গল, পালাবার কোনও পথ নেই। চোখের পলক না পড়তেই নাচার হয়ে তার বুক লক্ষ্য করে আমি বন্দুক

ছুড়লুম। তা ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না—আমরা যেখানে এসে পড়েছি সেখানকার একমাত্র নিয়ম হচ্ছে—হয় মারো, নয় মরো!

গুলি খেয়েই সে তার বিরাট দেহ নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং আবার উঠবার আগেই তার দুই চক্ষুর মাঝখানে টিপ করে ফের আমি বন্দুক ছুড়লুম। বড়ো বন্দুকটা আমার হাতে ছিল না—কাজেই আমার পক্ষে উচিত ছিল এ সময় তার হাটু টিপ করে গুলি ছোড়া, হয়তো তা হলে সেখানেই তাকে অচল হয়ে বসে পড়তে হত। কিন্তু আমার এই ছোটো বন্দুকের গুলি খেয়ে একটুও কাবু হল না—এবং হামিজির হাত থেকে বড়ো বন্দুকটা নেওয়ার আগেই সে আবার উঠে দাঁড়াল এবং মূর্তিমান বিভীষিকার মতো আমাদের দিকে ছুটে এল। আমার আর কোনও উপায় নেই, কারণ আমি দু-দুবার বন্দুক ছুড়েছি, এখন আমার বন্দুক একেবারে খালি। ভাবলুম হামিজির হাতে আমার বড়ো বন্দুকটা আছে, নিশ্চয় সে সেটাকে ছুঁড়বে। কিন্তু কোনও বন্দুকেরই আওয়াজ শুনতে পেলুম না। তার বদলে দেখলুম, বিপুল একটা কালো দেহ আমার উপর এসে পড়েছে, তার মস্ত বড়ো মুখখানা হাঁ করে আছে এবং প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার করতে করতে সে আমার দিকে ছুটে আসছে! পরমুহূর্তে কী যে হল জানতে পারলুম না, কিন্তু এইটুকু অনুভব করলুম অজগর সাপের চেয়েও মোটা কী যে কী একটা, সজোরে আমাকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ছুড়ে ফেলে দিলে! অনেক তফাতে গিয়ে আমি পড়লুম এক বাবলাগাছের খুব উঁচু কাটা-ভরা ডালের উপরে!

আমার গায়ের কোনও হাড় ভেঙে গেল না বটে, কিন্তু একটা তীক্ষ্ণ কাঁটাগাছের উপরে গিয়ে পড়লে প্রত্যেক ভদ্রলোকের যেমন চ্যাঁচানো উচিত, তেমনি করে চ্যাঁচাতে আমি যে কোনও কসুর করলুম না সেটা তো তোমরা বুঝতেই পাচ্ছ! সেই কাঁটাগাছের ডালের উপরেই অসহায়ভাবে আমি ঝুলতে লাগলুম।

সর্বাঙ্গে কাঁটার বিষম আদর যে কোনও ভদ্রলোকেরই ভালো লাগে না, সে কথা বলা বাহুল্য। সেই যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ শুনলুম হামিজির ভয়ংকর আর্তনাদ! হামিজির গায়ে ছিল টকটকে-রাঙা এক পোশাক,—শিকারের সময় যে-পোশাক পরে আসা কারুরই উচিত নয়। সেই কণ্টক-শয্যায় প্রায় শূন্যের উপরে শুয়েও আমি দেখতে পেলুম হাতিটা আমার জন্যে আর একটুও মাথা না ঘামিয়ে হামিজির দিকেই ছুটে গেল। হাতি, গন্ডার, মোষ প্রভৃতি রাঙা-পোশাক দেখলে খেপে যায়। হামিজি প্রাণপণে ছুটছে, আর সেই মত্ত হস্তীটা রাঙা রং দেখে পাগলের মতো রেগে উঠে তার দিকে তিরের মতো বেগে এগিয়ে চলেছে! হামিজির জন্যে আমি বেঁচে গেলুম—হাতিটা আমার দিকে আর ফিরেও তাকাল না।

কোনও রকমে যখন আমি মাটিতে গিয়ে নামলুম, সেই মত্ত হস্তীটা তখন তার বিরাট দেহ নিয়ে—বেচারা হামিজির ক্ষুদ্র দেহের উপরে গিয়ে পা ফেলে দাঁড়িয়েছে। সে শূন্যে শুঁড় আস্ফালন করছে, দাঁত দিয়ে হামিজির দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করছে আর বড়ো বড়ো থামের মতো পা দিয়ে তাকে দলন করছে!

সামনেই আমার বন্দুকটা পড়েছিল। তাড়াতাড়ি আমি সেটা তুলে নিলুম। তারপর আমার সেই সাহসী ও বিশ্বস্ত ভৃত্যকে উদ্ধার করবার জন্য ছুটে গেলুম।

আমি হাতিটার খুব কাছেই গিয়ে তার বিরাট দেহ লক্ষ্য করে এক সঙ্গেই বন্দুকের দুটাে নলের দুটো গুলি ছুড়লুম! দু-দুটো গুলি খেয়ে হাতিটার সমস্ত বীরত্ব উবে গেল—ল্যাজ পেটের তলায় ঢুকিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করতে করতে সামনের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল!

হাতিটা চলে যাওয়ার পর আমি হামিজির দিকে ছুটে গেলুম। কিন্তু তার দেহের দিকে একবার চেয়েই বুঝতে পারলুম, হামিজির বাঁচবার আর কোনও আশা নেই। তার দেহ দেখে মনে হয় না যে সেটা মানুষের দেহ! চার পা দিয়ে মাড়িয়ে আর শুড় ও দাঁতের আঘাতে হামিজির দেহটাকে হাতিটা এক মাংসপিণ্ডে

পরিণত করেছে। হামিজির কোমর থেকে গলা পর্যন্ত দেখলে সর্বাঙ্গ যেন শিউরে ওঠে। খালি রক্ত আর মাংসের পিণ্ড, আর কিছু নয়! তার পা দুটোর আর হাত দুটোর কোনও চিহ্ন নেই বললেই হয়। হামিজির হাতে আমার যেভারী বন্দুকটা ছিল সেটাও বেঁকে দুমড়ে এরকম হয়ে গেছে যে তাকে আর বন্দুক বলে চেনাই যায় না!

মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব, হামিজির জন্যে তা করতে আমি ত্রুটি করিনি। যখন আমি তার মুখে জল ঢেলে দিচ্ছিলুম, হামিজি তখনই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে। সে দুই চোখ খুলে নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল এবং আমার মনে হল, আমার কাছ থেকে বাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছে বলে তার দুই চোখে ফুটে উঠল গভীর কী দুঃখের ভাব! তারপরেই সব শেষ হয়ে গেল!

হতভাগ্য হামিজি! বীর, সাহসী, বিশ্বাসী হামিজি! বছরের পর বছর আমার পাশে পাশে ছায়ার মতো থেকেছে, কিন্তু অতি বড়ো বিপদেও কখনও সে আমায় ত্যাগ করেনি। তার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী নই, কিন্তু তার জন্যে আজ আমার প্রাণ কাঁদতে লাগল।

মনে আছে, সে রাত্রে আমি কোনও খাবার খেতে পারিনি; সমস্ত রাত ঘুমুতে পারিনি,— আমার সেই প্রিয়তম ভৃত্যের সেই ভয়ানক মৃত্যু এ জীবনে কখনও ভুলতে পারব না! সেইদিন থেকে আমি শিকার ছেড়ে দিয়েছি।

কিন্তু একটা কথা এখানে বলে রাখি। যে-হাতিটা হামিজির মৃত্যুর কারণ, দু-দিন পরেই তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেল! আমার গুলির আঘাতে খানিকক্ষণ পরেই তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। তার দাঁত দুটো ছিল খুব মস্ত আর সে-দুটোর দামও ছিল অনেক হাজার টাকার।

কিন্তু সেই দাঁত দুটো পাওয়ার জন্যে আমার মনে কোনওই আগ্রহ ছিল না। এর বদলে যদি আমার হামিজিকে পেতুম!

সেইদিন থেকে আমি শিকার ছেড়ে দিয়েছি।